তবে তাদের জন্য ঐ মালের তিন ভাগের দুই অংশ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতামাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক অংশ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক অংশ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক অংশ ওসিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী তোমরা জান না। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত অংশ—নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী রুকূতে لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

আয়াতে উত্তরাধিকারের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের কোন কোন প্রকারের বিশদ বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন অবস্থাসাপেক্ষে তাদের অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত কিছু বিবরণ সূরার শেষে বর্ণিত হবে এবং অবশিষ্ট অংশগুলো হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। ফিকহ্‌বিদরা কোরআন ও হাদীস থেকে এর বিস্তারিত বিবরণ চয়ন করে 'ফারায়েয'-এর আকারে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র রচনা করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে সন্তান-সন্ততি ও পিতা-মাতার অংশ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে আরও কিছু মাস'আলা উল্লিখিত হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে আদেশ দেন তোমাদের সন্তানদের (উত্তরাধিকার স্বত্ব পাওয়া) সম্পর্কে। (তা এই যে,) পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান (অর্থাৎ পুত্র-কন্যা একজন একজন কিংবা কয়েকজন মিশ্রিত থাকলে, তাদের অংশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হবে এই যে, প্রত্যেক পুত্র দ্বিগুণ এবং প্রত্যেক কন্যা এক গুণ পাবে।) এবং যদি (সন্তানদের মধ্যে) শুধু কন্যাই থাকে, যদিও দু'এর অধিক হয়, তবে কন্যারা তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে ঐ সম্পত্তির, যা মৃত ব্যক্তি ছেড়ে যায়। (আর যদি দুই কন্যা হয়, তবে তো তিন ভাগের দুই ভাগ পাওয়া বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কেননা, যদি তাদের মধ্যে এক কন্যার স্থলে পুত্র থাকতো, তবে এক কন্যার অংশ তার ভাই-এর তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও এক-তৃতীয়াংশ থেকে হ্রাস পেত না। সুতরাং দ্বিতীয়টিও যখন কন্যা, তখন এক-তৃতীয়াংশ থেকে হ্রাস পাওয়া সম্ভব নয়। উভয় কন্যা একই অবস্থায় আছে। সুতরাং তারও এক-তৃতীয়াংশ হবে। এভাবে উভয়ে মোট দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। তাই বলা হয়েছে যে, যদিও কন্যারা দুই-এর অধিক হয়; তবুও অংশ দুই-তৃতীয়াংশের অধিক হবে না।) এবং যদি একই কন্যা থাকে, তবে সে (সমস্ত ত্যাজ্য সম্পত্তির) অর্ধেক পাবে (এবং প্রথম মাস'আলার অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ এবং শেষোক্ত মাস'আলার অবশিষ্ট অর্ধেক অন্যান্য বিশেষ বিশেষ আত্মীয় পাবে কিংবা যদি কেউ না থাকে, তবে পুনরায় তাকেই দেওয়া হবে। ফারায়েয গ্রন্থসমূহে এরূপই বর্ণিত আছে)। আর পিতা-মাতার (অংশ পাওয়া তিন প্রকার। এক প্রকার এই

যে, তাদের) জন্য (অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকের জন্য) মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক (নির্ধারিত আছে) যদি মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি থাকে (পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রী, একজন হোক কিংবা বেশী। অবশিষ্ট সম্পত্তি সন্তানরা এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ওয়ারিস পাবে। এর পরও অবশিষ্ট থাকলে পুনরায় সবাইকে দেওয়া হবে।) এবং যদি (মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি না থাকে এবং শুধু পিতা-মাতাই তার ওয়ারিস হয়, (এটা দ্বিতীয় প্রকার। 'শুধু' বলার কারণ এই যে, ভাই-বোনও নেই ; যেমন পরে বর্ণিত হবে)। তবে (এমতাবস্থায়) তার মাতার অংশ তিন-ভাগের এক (এবং অবশিষ্ট তিন-ভাগের দুই পিতার। বর্ণিত মাস'আলায় এটা সুস্পষ্ট ছিল, তাই বিস্তারিত উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় নি)। এবং যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন (যে কোন প্রকারের) থাকে (মা-বাপ উভয়ের মধ্যে শরীক হোক, যাকে সহোদর বলে কিংবা শুধু বাপ এক ও মা ভিন্ন ভিন্ন হোক, যাকে বৈমাত্রেয় বলে। মোট কথা, যে কোন প্রকার ভাই-বোন যদি একাধিক থাকে আর তার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং পিতা-মাতা থাকে, এটা তৃতীয় প্রকার)। তবে (এমতাবস্থায়) মা (ত্যাজ্য সম্পত্তির) ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। (আর অবশিষ্ট অংশ পাবে পিতা। এ সব অংশ) মৃত ব্যক্তির কৃত ওসিয়্যত (-এর পরিমাণ মালও) বের করে নেওয়ার পর কিংবা ঋণের (যদি থাকে তাও বের করে নেওয়ার) পর (বন্টন হবে)। তোমাদের যেসব উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন রয়েছে, তোমরা (তাদের সম্পর্কে) পূর্ণরূপে জানতে পার না যে, তাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তোমাদেরকে (ইহলৌকিক ও পারলৌকিক) উপকার পৌঁছানোর ব্যাপারে (আশার দিক দিয়ে) নিকটবর্তী। (অর্থাৎ এ ব্যাপারটি যদি তোমাদের অভিমতের উপর ছেড়ে দেওয়া হতো, তবে অবস্থাদৃষ্টে তোমরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অধিকতর উপকার পৌঁছানোর লক্ষ্যে অগ্রপশ্চাৎ ও কম-বেশী বন্টন করতে। এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার কোন পন্থা কারও জানা নেই। অতএব, একে ভিত্তি সাব্যস্ত করা নির্ভুল নয়। সুতরাং 'উপকার পৌঁছানো' ভিত্তি হওয়ার যোগ্য নয়। তাই অন্যান্য উপযোগিতা ও রহস্যকে— যদিও সেগুলো তোমাদের বোধগম্য নয় ও বিধানের ভিত্তি সাব্যস্ত করে। এ বিধান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে ! (এটা নিশ্চিতরূপে স্বীকৃত যে,) আল্লাহ্ তা'আলা সুবিজ্ঞ ও রহস্যবিদ। (সুতরাং তিনি নিজ জ্ঞান থেকে এ ব্যাপারে যেসব রহস্য বিবেচনা করছেন, সেগুলোই বিবেচ্য। তাই তোমাদের অভিমতের উপর ছেড়ে দেন নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সম্পদ বন্টনের পূর্বে করণীয় ঃ শরীয়তের নীতি এই যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমে শরীয়তানুযায়ী তার কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপণতা উভয়টি নিষিদ্ধ। এরপর তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। যদি ঋণ সম্পত্তির সম পরিমাণ কিংবা তারও বেশী হয়, তবে কেউ ওয়ারিসী স্বত্ব পাবে না এবং কোন ওসিয়্যত কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে কিংবা ঋণ একেবারেই না থাকে, তবে সে কোন ওসিয়্যত করে থাকলে এবং তা গোনাহর ওসিয়্যত না হলে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে তা কার্যকর হবে। যদি সে তার সমস্ত সম্পত্তি

ওসিয়্যত করে যায় তবুও এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়্যত কার্যকর হবে না। এমনটি করা সমীচীন নয় এবং ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করার নিয়তে ওসিয়্যত করা পাপ কাজও বটে।

ঋণ পরিশোধের পর এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসিয়্যত কার্যকর করে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরীয়তসম্মত ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ ফরায়েয গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য। ওসিয়্যত না থাকলে ঋণ পরিশোধের পর সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

সন্তানের অংশ ঃ পূর্ববর্তী রুকূতে বর্ণিত হয়েছে যে, নিকটবর্তিতার ক্রমানুসারে ওয়ারিসী স্বত্ব বন্টন করতে হবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান ও পিতা-মাতা যেহেতু সর্বাধিক নিকটবর্তী, তাই তারা সর্বাবস্থায় ওয়ারিসী স্বত্ব পায়। এ দু'টি সম্পর্ক মানুষের অধিকতর নিকটবর্তী ও প্রত্যক্ষ। অন্যান্য সম্পর্ক পরোক্ষ। কোরআন পাকে প্রথমে তাদেরই অংশ বর্ণিত হয়েছে এবং সন্তানের অংশ দ্বারা সে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ এটি এমন একটি সামগ্রিক বিধি যে, পুত্র ও কন্যা উভয়কে ওয়ারিসী স্বত্বের অধিকারীও করেছে এবং প্রত্যেকের অংশও নির্ধারিত করে দিয়েছে। এ থেকে এ নীতি জানা গেল যে, মৃত ব্যক্তির অংশীদারদের মধ্যে পুত্র ও কন্যা উভয় শ্রেণীর সন্তান থাকলে তাদের অংশের সম্পত্তি এভাবে বন্টন করা হবে যে, প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ পাবে। উদাহরণত কেউ এক পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেলে সম্পত্তিকে চার ভাগ করে চার ভাগের দুই ভাগ পুত্রকে এবং চার ভাগের এক ভাগ হারে প্রত্যেক কন্যাকে দেওয়া হবে।

কন্যাদেরকে অংশ দেওয়ার গুরুত্ব ঃ কোরআন পাক কন্যাদেরকে অংশ দেওয়ার প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, কন্যাদের অংশকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করে এর অনুপাতে পুত্রদের অংশ ব্যক্ত করেছে এবং لِلْأُنْثَيَيْنِ مِثْلُ حَظِّ الذَّكَرِ (দুই কন্যার অংশ এক পুত্রের অংশের সমপরিমাণ) বলার পরিবর্তে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ) বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

অনেকেই বোনদেরকে অংশ দেয় না এবং বোনরা একথা চিন্তা করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে ক্ষমা করে দেয় যে, পাওয়া যখন যাবেই না, তখন ভাইদের সাথে মন কষাকষির দরকার কি! এরূপ ক্ষমা শরীয়তের আইনে ক্ষমাই নয়; ভাইদের যিম্মায় তাদের হক পাওনা থেকে যায়। যারা এভাবে ওয়ারিসী স্বত্ব আত্মসাৎ করে, তারা কঠোর গোনাহ্গার। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নাবালেগা কন্যাও থাকে। তাদেরকে অংশ না দেওয়া দ্বিগুণ গোনাহ্। প্রথম গোনাহ্ শরীয়তসম্মত ওয়ারিসের অংশ আত্মসাৎ করার এবং দ্বিতীয় গোনাহ্ ইয়াতীমের সম্পত্তি হজম করে ফেলার।

এরপর আরও ব্যাখ্যা সহকারে কন্যাদের অংশ বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ অর্থাৎ যদি পুত্র সন্তান না থাকে, শুধু একাধিক কন্যাই থাকে, তবে তারা ত্যাজ্য সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। এতে সব কন্যাই সমান অংশীদার হবে। অবশিষ্ট তিন ভাগের এক অন্যান্য ওয়ারিস যেমন মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা, স্ত্রী অথবা স্বামী প্রমুখ পাবে। কন্যাদের সংখ্যা দুই বা তার বেশী হলে দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে তারা সমান অংশীদার হবে।

দুই-এর অধিক কন্যার বিধান কোরআনে فَوْقَ اثْنَتَيْنِ শব্দের মধ্যে স্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে দুই কন্যার বিধানও তাই, যা দুই-এর অধিকের বিধান। এর প্রমাণ হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে ঃ

عن جابربن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امراة من الانصار فى الاسواف فجاءت المراة بابنتين لها - فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم احد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله ولم يدع ما لا الا اخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان ابدا الا ولهما مال - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى الله فى ذلك - وقال نزلت سورة النساء "يوصيكم الله فى اولادكم" الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لى المرأة وصاحبها فقال لعمهما اعطهما الثلثين واعط امهما الثمن وما بقى فلك -

—হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ একবার আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বাইরে বের হলাম। ইতিমধ্যে আসওয়াফ নামক স্থানে জনৈকা আনসার মহিলার কাছে গেলাম। মহিলা তার দুই কন্যাকে নিয়ে এলো এবং বলতে লাগলো ঃ হে আল্লাহ্র রসূল! এ কন্যাদ্বয় (আমার স্বামী) সাবেত ইবনে কায়েসের। সে আপনার সঙ্গী হয়ে ওহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছে। এদের চাচা এদের পিতার যাবতীয় ত্যাজ্য সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে এবং এদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি? আল্লাহ্র কসম! যদি কন্যাদের কাছে অর্থ-সম্পদ না থাকে, তবে কেউ তাদেরকে বিয়ে করতেও সম্মত হবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) একথা শুনে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে ফয়সালা দেবেন। হযরত জাবের (রা) বলেন ঃ অতঃপর যখন সূরা নিসার আয়াত يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ — অবতীর্ণ হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ঐ মহিলা ও তার দেবরকে (অর্থাৎ কন্যাদের চাচা, যে সমস্ত সম্পত্তি কুক্ষিগত করে নিয়েছিল) ডেকে আন। তিনি কন্যাদের চাচাকে বললেন ঃ কন্যাদ্বয়কে মোট সম্পত্তির

তিন ভাগের দুই ভাগ দিয়ে দাও। তাদের মাতাকে দাও আট ভাগের একভাগ। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে, তুমি নিজে নাও।---(আবূ দাউদ, তিরমিযী)

এই হাদীসে বর্ণিত মাস'আলায় রসূলুল্লাহ্ (সা) দুই কন্যাকেও তিন ভাগের দুই ভাগ দিয়েছেন। দুই এর অধিক কন্যার বিধান স্বয়ং কোরআনে তাই বর্ণিত হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির যদি এক কন্যা থাকে এবং পুত্রসন্তান মোটেই না থাকে, তবে সে তার পিতা-মাতার ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি অন্য ওয়ারিসরা পাবে।

পিতা-মাতার অংশ ঃ এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার অংশ বর্ণনা করেছেন এবং এর তিনটি অবস্থা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম অবস্থা ঃ পিতা-মাতা উভয়ই জীবিত এবং সন্তানাদিও রয়েছে, তা এক পুত্র অথবা কন্যাই হোক না কেন। এমতাবস্থায় পিতা-মাতা প্রত্যেকেই ছয় ভাগের এক ভাগ হারে পাবে। অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য ওয়ারিস সন্তান ও স্ত্রী অথবা স্বামী পাবে। কোন কোন অবস্থায় অবশিষ্ট কিছু অংশ পুনরায় পিতা পেয়ে থাকে যা তার জন্য নির্ধারিত ষষ্ঠাংশের অতিরিক্ত।

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির সন্তান ও ভাই-বোন কিছুই নেই, শুধু পিতা-মাতা আছে। এমতাবস্থায় ত্যাজ্য সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ মাতা এবং অবশিষ্ট তিন ভাগের দুই ভাগ পিতা পাবে। এ বিধান তখনই বলবৎ হবে, যখন মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে স্বামী অথবা স্ত্রী জীবিত থাকবে না। স্বামী অথবা স্ত্রী বেঁচে থাকলে সর্বপ্রথম তাদের অংশ পৃথক করা হবে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ মাতা এবং তিন ভাগের দুই ভাগ পিতা পাবে।

তৃতীয় অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির যদি সন্তানাদি না থাকে; কিন্তু ভাই-বোন থাকে যাদের সংখ্যা দুই ভাই কিংবা দুই বোন অথবা দুই-এর বেশী। এমতাবস্থায় মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। যদি অন্য কোন ওয়ারিস না থাকে, তবে অবশিষ্ট ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ পাবে পিতা। মৃত ব্যক্তির ভাই ও বোনের বর্তমানে মাতার অংশ হ্রাস পাবে, কিন্তু তার ভাই-বোন কিছুই পাবে না। কেননা, পিতা ভাই-বোনের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী। কাজেই যা অবশিষ্ট থাকবে পিতাই পাবে। এমতাবস্থায় মাতার অংশ তিন ভাগের এক ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে। যে ভাই-বোনের কারণে মাতার অংশ কমে যায়, তারা সহোদর হোক কিংবা বৈমাত্রেয় হোক অথবা বৈপিত্রেয় হোক, সর্বাবস্থায় তাদের বর্তমানে মায়ের অংশ হ্রাস পায়। তবে শর্ত হল এই যে, অংশীদার একাধিক হতে হবে।

নির্ধারিত অংশসমূহ বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে ঃ

اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ

اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি ও পিতা-মাতার এসব অংশ আল্লাহ্ তা'আলা নিজের মতে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং তিনি রহস্যবিদ। যেসব অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলোতে অনেক রহস্য রয়েছে। যদি তোমাদের অভিমতের উপর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারটি ছেড়ে দেওয়া হতো, তবে তোমরা উপকারী হওয়াকে বন্টনের ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করতে। কিন্তু উপকারী কে হবে এবং সর্বাধিক উপকার কার দ্বারা হতে পারে, এর নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা তোমাদের পক্ষে কঠিন ছিল। তাই উপকারী হওয়ার পরিবর্তে অধিক নিকটবর্তী হওয়াকে এ বিধানের ভিত্তি করা হয়েছে।

কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত বলে দিয়েছে যে, ত্যাজ্য সম্পত্তির যেসব অংশ আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত করেছেন, সেগুলো তাঁর অকাট্য বিধান। এ ব্যাপারে কারও মন্তব্য করা অথবা কমবেশী করার অধিকার নেই। একে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করা তোমাদের কর্তব্য। তোমাদের স্রষ্টা ও পরওয়ারদিগারের এ বিধান চমৎকার রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। তোমাদের উপকারের কোন দিক তাঁর জ্ঞানের পরিধির বাইরে নয়। তিনি যা কিছু আদেশ করেন, তা কোন তাৎপর্য থেকে খালি নয়। তোমাদের মধ্যে নিজেদের উপকার ও অপকারের সত্যিকার জ্ঞান থাকতে পারে না। যদি ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারটি স্বয়ং তোমাদের মতামতের উপর ছেড়ে দেওয়া হতো, তবে তোমরা স্বল্পজ্ঞানহেতু নিশ্চয়ই নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতে না। ফলে বন্টনের ব্যাপারে অসমতা দেখা দিতো। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজটি নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন, যাতে সম্পত্তি বন্টনে ন্যায় ও সুবিচার পুরোপুরিভাবে বহাল থাকে এবং মৃত ব্যক্তির সম্পদ ন্যায়ভিত্তিক পন্থায় বিভিন্ন অধিকারীর হাতে প্রবন্টিত হয়।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ۭ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ۭ

(১২) তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়; ওসিয়্যতের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর।

স্ত্রীদের জন্য এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওসিয়্যতের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যোগসূত্র ঃ এ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির সাথে বংশগত ও জন্মগত সম্পর্কশীল ওয়ারিসদের অংশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে অন্যান্য কিছুসংখ্যক ওয়ারিসের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। মৃত ব্যক্তির সাথে তাদের সম্পর্ক বংশগত নয় বরং বৈবাহিক। এর বর্ণনা এরূপ ঃ

তোমরা ঐ সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, যা তোমাদের স্ত্রীরা ছেড়ে যায় যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি স্ত্রীদের কোন সন্তান থাকে (তোমাদের ঔরসজাত হোক কিংবা অন্য স্বামীর) তবে (এমতাবস্থায়) তোমরা তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে এক-চতুর্থাংশ পাবে (কিন্তু সর্বাবস্থায় এ ওয়ারিসী স্বত্ব) ওসিয়্যত (পরিমাণ মাল) বের করার পর, যা তারা ওসিয়্যত করে, অথবা ঋণ যদি থাকে, (তবে তা) বের করার পর (পাবে)। স্ত্রীরা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে (একজন হোক কিংবা একাধিক। একাধিক হলে এক-চতুর্থাংশ সবার মধ্যে সমহারে বন্টন করা হবে) যদি তোমাদের (এক বা একাধিক পুত্র বা কন্যা) কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে (এমতাবস্থায়) তারা (একজন হোক কিংবা কয়েকজন) তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ পাবে। (এটাও দুই প্রকার। উভয় প্রকারে অবশিষ্ট সম্পত্তি অন্য ওয়ারিসরা পাবে। কিন্তু এ ওয়ারিসী স্বত্ব) ওসিয়্যত পরিমাণ মাল বের করার পর, যা তোমরা ওসিয়্যত কর কিংবা ঋণের (যদি থাকে, তাও বের করার) পর (পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

স্বামী ও স্ত্রীর অংশ ঃ উপরোক্ত বর্ণনায়ও স্ত্রীর অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমে স্বামীর অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। একে প্রথমে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এর গুরুত্ব প্রকাশ করা। কেননা, স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী ভিন্ন পরিবারের লোক হয়ে যায়। যদি পিত্রালয়ে স্ত্রীর মৃত্যু হয় তার সম্পত্তি সেখানেই থাকে, তবে স্বামীর অংশ দেওয়া থেকে গা বাঁচানোর চেষ্টা হতে পারে। এ অন্যায়ের অবসান ঘটানোর জন্যই বোধ হয় স্বামীর অংশ প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। মৃতা স্ত্রীর যদি কোন সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়্যত কার্যকর করার পর স্বামী তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। অবশিষ্ট অর্ধেক থেকে অন্যান্য ওয়ারিস যেমন মৃতার পিতা-মাতা, ভাই-বোন যথারীতি অংশ পাবে।

মৃতার যদি সন্তান থাকে, এক বা একাধিক---পুত্র বা কন্যা, এ স্বামীর ঔরসজাত হোক বা পূর্ববর্তী কোন স্বামীর ঔরসজাত, তবে বর্তমান স্বামী ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়্যত কার্যকর করার পর মৃতার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ অন্য ওয়ারিসরা পাবে। এ হচ্ছে স্বামীর অংশের বিবরণ।

পক্ষান্তরে যদি স্বামী মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়্যত কার্যকর করার পর স্ত্রী মোট সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি মৃত স্বামীর সন্তান থাকে, এ স্ত্রীর গর্ভজাত হোক কিংবা অন্য স্ত্রীর, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়্যত কার্যকর করার পর স্ত্রী আট ভাগের একভাগ পাবে। স্ত্রী একাধিক হলেও উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী এক অংশ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমহারে বন্টন করা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীই এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশ পাবে না, বরং সবাই মিলে এক চতুর্থাংশ কিংবা এক অষ্টমাংশের অংশীদার হবে। উভয় অবস্থাতে স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তাদের অন্য ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

মাস'আলা ঃ প্রথমে দেখা উচিত যে, যদি স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করা না হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মতই প্রথমে মোট ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে মোহরানা পরিশোধ করার পর ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। মোহরানা দেওয়ার পর স্ত্রী ওয়ারিসী স্বত্বে অংশীদার হবার দরুন এ অংশও নেবে। মোহরানা পরিশোধ করার পর যদি মৃত স্বামীর সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মত সম্পূর্ণ সম্পত্তি মোহরানা বাবদ স্ত্রীকে সমর্পণ করা হবে এবং কোন ওয়ারিসই অংশ পাবে না।

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي
الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً
مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝١٢

যে পুরুষের, ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে ওসিয়্যতের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যোগসূত্র ঃ বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কশীলদের সংক্ষিপ্ত হক বর্ণনা করার পর এখন এমন মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, যার সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও স্ত্রী নেই।

যদি কোন মৃত, যার ত্যাজ্য সম্পত্তি অন্যেরা পাবে সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রী, যদি তার উর্ধ্বতন (অর্থাৎ বাপ-দাদা) এবং অধঃস্তন (অর্থাৎ সন্তান ও পুত্রের সন্তান)

এবং তার (অর্থাৎ মৃতের বৈপিত্রেয়) এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যদি তারা এর চাইতে (অর্থাৎ একের চাইতে) অধিক (দুই কিংবা বেশী) হয় তবে তারা সবাই এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে (সমান) অংশীদার হবে (তাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী সমান অংশ হবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি অন্য ওয়ারিসরা পাবে এবং কেউ না থাকলে পুনরায় তাদেরকেই দেওয়া হবে। এ হলো দুই প্রকার। উভয় প্রকারে এ ওয়ারিসী স্বত্ব) ওসিয়্যত (পরিমাণ মাল) বের করার পর, যা ওসিয়্যত করা হয় কিংবা (যদি) ঋণ (থাকে, তাও) পরিশোধ করার পর (পাবে।) শর্ত এই যে, (ওসিয়্যত-কারী) কারও (অর্থাৎ কোন ওয়ারিসের) ক্ষতি না করে (বাহ্যতও না, ইচ্ছাকৃতও না। বাহ্যত যেমন এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়্যত করা। এ ওসিয়্যত ওয়ারিসী স্বত্বের উপর অগ্রগণ্য হবে না! ইচ্ছাকৃত এই যে, এক-তৃতীয়াংশের মধ্যেই ওসিয়্যত করলো, কিন্তু ওয়ারিসদের অংশ কমানোর নিয়তে করলো। এ ওসিয়্যত বাহ্যত কার্যকর হয়ে যাবে; কিন্তু গোনাহ হবে) এ নির্দেশ (যতটুকু এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ, (তিনি জানেন কে মানে এবং কে মানে না, তাদেরকে যে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না, এর কারণ তিনি) সহনশীল (ও) বটে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'কালালার' ওয়ারিসী স্বত্ব ঃ আলোচ্য আয়াতে 'কালালার' পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। কালালার অনেক সংজ্ঞা আছে। আল্লামা কুরতুবী এগুলো স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে—অর্থাৎ যে মৃত ব্যক্তির ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন কেউ নেই, সে-ই 'কালালা'।

রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার লিখেন ঃ 'কালালা' শব্দটি আসলে ধাতু। এর অর্থ পরি-শ্রান্ত হওয়া, যা দুর্বলতার পরিচায়ক। পিতা-পুত্রের আত্মীয়তা ব্যতীত অন্য আত্মীয় তাকে 'কালালা' বলা হয়েছে। কেননা এ আত্মীয়তা পিতা-পুত্রের আত্মীয়তার তুলনায় দুর্বল।

অতঃপর 'কালালা' শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এক—ঐ মৃত ব্যক্তি, যে কোন সন্তান ও পিতা রেখে যায়নি। দুই—ঐ ওয়ারিস, সে মৃতের পুত্র বা পিতা নয়। অভিধানের দিক দিয়ে যে মূল ধাতু বলা হয়েছে, সেই অনুযায়ী 'কালালা' শব্দের অর্থ 'যু-কালালা' অর্থাৎ 'দুর্বল সম্পর্কধারী' হওয়া দরকার। তিন—ঐ ত্যাজ্য সম্পত্তি, যা পুত্র ও পিতাবিহীন মৃত ব্যক্তি রেখে যায়।

মোট কথা এই যে, যদি কোন পুরুষ কিংবা স্ত্রী মারা যায়, তার বাপ-দাদা ও সন্তানাদি না থাকে এবং সে এক বৈপিত্রেয় ভাই কিংবা বোন রেখে যায়, তবে তাদের মধ্যে ভাই হলে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে এবং ভাই না থাকলে বোন ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি অধিক হয়, উদাহরণত এক ভাই ও এক বোন হয় কিংবা দুই ভাই কিংবা দুই বোন হয়, তবে সবাই মৃতের মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে। এক্ষেত্রে পুরুষ স্ত্রীর দ্বিগুণ পাবে না। আল্লামা কুরতুবী বলেন ঃ

وليس فى الفرائض موضع يكون فيه الذكر والانثى سواء الا فى ميراث الاخوة للام ٥

অর্থাৎ একমাত্র বৈপিত্রেয় ভাই-বোন ছাড়া ফরায়েযের আর কোথাও স্ত্রী-পুরুষের সমান অংশ হয় না।

ভাই-বোনের অংশ ঃ প্রকাশ থাকে যে, এ আয়াতে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও আয়াতে বৈপিত্রেয় শর্তটি উল্লিখিত নেই, কিন্তু ইজ্‌মার মাধ্যমে এটা সাব্যস্ত হয়েছে। হযরত সা'দ ইবনে আবী-ওয়াক্কাসের কিরআতও এ আয়াতে এভাবে ولاخ اواخت من امه আল্লামা কুরতুবী, আবূ বকর জাসসাস প্রমুখ তফসীর-বিদ তাই উদ্ধৃত করেছেন। কিরআতটি মুতাওয়াতির নয়; কিন্তু ইজমা হওয়ার কারণে কার্যক্ষেত্রে গ্রহণীয়। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নিসার শেষাংশেও কালালার ওয়ারিসী স্বত্ব বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে যে, এক বোন হলে সে অর্ধেক পাবে এবং এক ভাই হলে বোনের সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। দুই বোন হলে দুই-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি পাবে। আর যদি একাধিক ভাই-বোন হয়, তবে পুরুষকে স্ত্রীর দ্বিগুণ দেওয়া হবে। সূরার শেষে বর্ণিত এই নির্দেশ সহোদর ভাই-বোন ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন সম্পর্কিত। এখানে যদি বৈমাত্রেয় ও সহোদর ভাইবোনকে শামিল করে নেওয়া হয়, তবে বিধানাবলীতে বৈপরীত্য অনিবার্য হয়ে যাবে।

ওসিয়্যত ঃ এ রুকূতে তিনবার ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ বর্ণনা করার সাথেই বলা হয়েছে যে, অংশসমূহের এই বন্টন ওসিয়্যত ও ঋণের পর হবে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, মৃতের কাফন-দাফনের পর মোট সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করা হবে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা থেকে এক-তৃতীয়াংশে ওসিয়্যত কার্যকর হবে। এর বেশী ওসিয়্যত হলে আইনত তা অগ্রাহ্য হবে। বিধানের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ ওসিয়্যতের পূর্বে। যদি ঋণ পরিশোধে সম্পত্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে ওসিয়্যতও কার্যকর হবে না এবং ওয়ারিসরাও কিছু পাবে না। এ রুকূতে যেখানে যেখানে ওসিয়্যতের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে ওসিয়্যত ঋণের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, ঋণের পূর্বে ওসিয়্যত কার্যকর করতে হবে। এ ভুল-বোঝাবুঝির অবসানকল্পে হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

انكم تقرؤن هذه الاية من بعد وصية توصون بها اودين وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ـ

অর্থাৎ তোমরা এ আয়াত তিলাওয়াত কর, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

—এতে 'ওসিয়্যত শব্দটি অগ্রে উল্লেখিত হলেও রসূলুল্লাহ্ (সা) একে ঋণের পরে কার্যকর হবে বলে বিধান দিয়েছেন। —(তিরমিযী)

এতদসত্ত্বেও এ তথ্য সম্পর্কে অবগত থাকা দরকার যে, ওসিয়্যত কার্যত যখন পশ্চাতে তখন বর্ণনায় অগ্রে উল্লেখ করার কারণ কি? রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার এ সম্পর্কে লিখেন ঃ

وتقديم الوصيّة على الدين ذكرًا مع ان الدين مقدم عليها حكمًا لاظهار كمال العناية بتنفيذها لكونها مظنة للتفريط في ادائها.....

অর্থাৎ আয়াতে ঋণের পূর্বে ওসিয়্যত উল্লেখ করার কারণ এই যে, ওসিয়্যত পরিত্যক্ত সম্পত্তির ন্যায় কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই পাওয়া যায় এবং এতে আত্মীয় হওয়াও জরুরী নয়। তাই ওয়ারিসদের পক্ষ থেকে একে কার্যকর করার ব্যাপারে ত্রুটি অথবা দেরী করার প্রবল আশংকা ছিল। মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি অন্যের কাছে যাওয়া ওয়ারিসদের কাছে অপ্রিয় ঠেকতে পারতো, তাই ওসিয়্যতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার জন্য একে ঋণের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক মৃতেরই ঋণগ্রস্ত থাকা জরুরী নয়। জীবদ্দশায় ঋণ থাকলেও মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকা জরুরী নয়। যদি মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকেও, তবে ঋণদাতার পক্ষ থেকে দাবী ওঠে। তাই ওয়ারিসরাও অস্বীকার করতে পারে না। এ কারণে এতে ত্রুটির আশংকা ক্ষীণ। ওসিয়্যত এরূপ নয়। কারণ, মৃত ব্যক্তি যখন ধন-সম্পদ রেখে যায়, তখন তার মন চায় যে, সদকায়ে-জারিয়া হিসেবে কিছু অংশ কোন সৎ কাজে ব্যয় করে যাবে। এখানে এই মালে কারও পক্ষ থেকে দাবী ওঠে না। তাই ওয়ারিসদের পক্ষ থেকে ত্রুটির আশংকা ছিল। এ ত্রুটির নিরসনকল্পে বিশেষভাবে সর্বত্র ওসিয়্যতকে অগ্রে রাখা হয়েছে।

মাস'আলা ঃ ঋণ ও ওসিয়্যত না থাকলে কাফন-দাফনের পর অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

কোন ওয়ারিসের জন্য ওসিয়্যত করলে তা কার্যকর হবে না। যদি কেউ পুত্র কন্যা, স্বামী অথবা স্ত্রীর জন্য কিংবা এমন কোন ব্যক্তির জন্য ওসিয়্যত করে, যে ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অংশীদার, তবে এ ওসিয়্যতের কোন মূল্য নেই। ওয়ারিসরা শুধু ওয়ারিসী স্বত্বের অংশ পাবে। এর অতিরিক্ত তারা কোন কিছুর অধিকারী নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন ঃ

ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث--অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারকে তার হক দান করেছেন। অতএব কোন ওয়ারিসের জন্য ওসিয়্যত চলবে না।

হ্যাঁ, যদি অন্য ওয়ারিসরা অনুমতি দেয়, তবে যে ওয়ারিসের জন্য ওসিয়্যত করা হয়েছে, তার জন্য ওসিয়্যত কার্যকর করে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরীয়তসম্মতভাবে বন্টন করতে হবে। এতে উক্ত ওয়ারিসও তার অংশ পাবে। কোন কোন হাদীসে الا ان يشاء الورثة বলে এর ব্যতিক্রমও উল্লিখিত হয়েছে। ---(হিদায়া)

غير مضار-এর তফসীর ঃ কালালার ওয়ারিসী স্বত্বের উপসংহারে এই ওয়ারিসী স্বত্ব ওসিয়্যত ও ঋণ পরিশোধের পর কার্যকর হবে বলে উল্লেখ করার পর

غير مضار বলা হয়েছে। এ শর্তটি যদিও শুধু এখানেই উল্লেখ করা হয়েছে ; কিন্তু এর পূর্বে অন্য যে দুজায়গায় ওসিয়্যত ও ঋণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও এ হুকুমই গ্রহণীয় ও কার্যকর হবে। এর উদ্দেশ্য এই যে, মৃত ব্যক্তির জন্য ওসিয়্যত কিংবা ঋণের মাধ্যমে ওয়ারিসদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বৈধ নয়। ওসিয়্যত করা কিংবা নিজের যিম্মায় ভিত্তিহীন ঋণ স্বীকার করার মধ্যে ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা লুক্কায়িত থাকা এবং সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও কবিরা গোনাহ্।

ঋণ অথবা ওসিয়্যতের মাধ্যমে হকদারকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কয়েকটি সম্ভাব্য উপায় হতে পারে। উদাহরণত কোন বন্ধুকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ঋণের স্বীকারোক্তি করা কিংবা নিজের ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ সম্পর্কে একথা প্রকাশ করা যে, এটি অমুকের আমানত, যাতে এতে ওয়ারিসী স্বত্ব না চলে কিংবা এক-তৃতীয়াংশের বেশী সম্পত্তি ওসিয়্যত করা অথবা কোন ব্যক্তির উপর নিজের অনাদায়ী ঋণ থাকলে মিছামিছি বলে দেওয়া যে, ঋণ আদায় হয়ে গেছে, যাতে ওয়ারিসরা না পায় কিংবা মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় এক-তৃতীয়াংশের বেশী কাউকে দান করে দেওয়া। এগুলো হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত করার উপায়। প্রত্যেক মৃত্যু-পথযাত্রীকেই জীবন সায়াহ্নে এ ধরনের অনিষ্টকর কার্য থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত।

নির্ধারিত অংশ-অনুযায়ী বন্টন করার তাকীদ ঃ অংশ বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ অর্থাৎ যেসব অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ঋণ ও ওসিয়্যত সম্পর্কে যে তাকীদ করা হয়েছে, এগুলো কার্যকর করা খুবই জরুরী। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি মহান ওসিয়্যত ও গুরুত্বপূর্ণ আদেশ। এর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। অতঃপর আরও হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে ঃ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সব জানেন। তিনি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেকের অবস্থা জেনে বুঝেই অংশ নির্ধারণ করেছেন। যারা উল্লিখিত বিধানসমূহ পালন করবে, তাদের এ নেকী আল্লাহ্র জ্ঞানের বাইরে নয়। পক্ষান্তরে যারা বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদের দুষ্কর্মও আল্লাহ্র গোচরীভূত। ফলে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে।

যে কোন মৃত ব্যক্তি ঋণ অথবা ওসিয়্যতের মাধ্যমে ন্যায্য অংশীদারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, আল্লাহ্ তার সম্পর্কেও জানেন ; তাঁর পাকড়াও থেকে ভয়-মুক্ত হয়ো না। তবে আল্লাহ্ বিরুদ্ধাচরণের কারণে ইহজগতে শাস্তি নাও দিতে পারেন। কারণ, তিনি সহনশীল। কাজেই বিরুদ্ধাচরণকারীদের 'বেঁচে গেলাম' বলে ধোঁকা খাওয়া উচিত নয়।

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

(১৩) এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য। (১৪) যে কেউ আল্লাহ্ ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমা অতিক্রম করে তিনি তাঁকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

যোগসূত্র ঃ ওয়ারিসী স্বত্বের উল্লিখিত বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর আলোচ্য এ দুটি আয়াতে সে সব বিধান মান্য করা ও বাস্তবায়িত করার ফযীলত এবং অমান্য করার শোচনীয় পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এতে উল্লিখিত বিধানসমূহের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলাই উদ্দেশ্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ওয়ারিসী স্বত্ব কিংবা ইয়াতীম সম্পর্কিত বিধানাবলী)—উল্লিখিত এ সব বিধান আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের পূর্ণ আনুগত্য করবে (অর্থাৎ এসব বিধি-বিধান মেনে চলবে) আল্লাহ্ তাকে এমন বেহেশতসমূহে (তৎক্ষণাৎ) প্রবেশ করাবেন, যার (প্রাসাদসমূহের) তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের কথা মানবে না এবং (সম্পূর্ণতই) তাঁর বিধি লংঘন করবে (অর্থাৎ মেনে চলাকে জরুরীও করবে না; এটা কুফরের অবস্থা।) তাকে (দোযখের) আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে অনন্তকাল থাকবে এবং তার অপমানকর শাস্তি হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআন পাকের বর্ণনা পদ্ধতি এই যে, বিধানাবলী বর্ণনা করার পর পরিশিষ্ট হিসাবে মান্যকারীদের জন্য উৎসাহবাণী এবং তাদের ফযীলত উল্লেখ করা হয় আর অমান্যকারীদের জন্য ভীতি প্রদর্শন, শাস্তি ও তাদের নিন্দা উল্লেখ করা হয়।

এখানেও বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। তাই আলোচ্য শেষ আয়াতে আনুগত্যকারী ও অবাধ্যকারীদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

ওয়ারিসী স্বত্বের বিধানাবলীর পরিশিষ্ট

মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না ঃ ওয়ারিসী স্বত্ব বন্টনের ভিত্তি বংশগত আত্মীয়তার উপর রচিত। কিন্তু কোন কোন বিষয়ের ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রথম, যার ওয়ারিস এবং যে ওয়ারিস তারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হতে পারবে না। কাজেই মুসলমান

কোন কাফিরের এবং কাফির কোন মুসলমানের ওয়ারিস হবে না, তাদের পরস্পরের মধ্যে যে কোন ধরনের বংশগত সম্পর্কই থাক না কেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم —অর্থাৎ মুসলমান কাফিরের এবং কাফির মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারবে না। —(মিশকাত)

এ বিধান তখনকার জন্য, যখন জন্মের পর থেকেই একজন ব্যক্তি মুসলমান অথবা কাফির হয়। কিন্তু কেউ যদি পূর্বে মুসলমান থাকে, এরপর (নাউযুবিল্লাহ্) ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে এরূপ ব্যক্তি মারা গেলে কিংবা নিহত হলে তার মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত ধন-সম্পদ মুসলমান ওয়ারিসরা পাবে। আর ধর্মত্যাগী অবস্থায় উপার্জিত মাল বায়তুল মালে জমা হবে।

কিন্তু কোন স্ত্রীলোক ধর্ম ত্যাগ করলে তার উভয় অবস্থার উপার্জিত ধন-সম্পদ মুসলমান ওয়ারিসরা পাবে। কিন্তু স্বয়ং ধর্মত্যাগী ব্যক্তি পুরুষ কিংবা স্ত্রী কোন মুসলমানের কাছ থেকে অথবা ধর্মত্যাগীর কাছ থেকে ওয়ারিসী স্বত্ব পাবে না।

হত্যাকারীর স্বত্ব ঃ যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, যার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে সে স্বত্বাধিকারী ছিল, তবে এ হত্যাকারী তার ওয়ারিসী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন القاتل لا يرث —অর্থাৎ হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না। —(মিশ্‌কাত) তবে ভুলবশত হত্যার কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে। বিস্তারিত তথ্য ফিকহ্ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

গর্ভস্থ সন্তানের স্বত্ব ঃ যদি কোন ব্যক্তি কয়েকজন সন্তান রেখে যায় এবং স্ত্রীর গর্ভেও সন্তান থাকে, তবে এই গর্ভস্থ সন্তানও ওয়ারিসদের তালিকাভুক্ত হবে। কিন্তু সন্তানটি পুত্র না কন্যা, একজন না বেশী, তা জানা যেহেতু দুষ্কর, তাই গর্ভের এ সন্তান জন্মগ্রহণ পর্যন্ত বন্টন মুলতবি রাখা উচিত। কোন কারণে যদি তাৎক্ষণিকভাবেই বন্টন জরুরী হয়, তবে গর্ভস্থ সন্তানকে এক পুত্র অথবা এক কন্যা উভয়ের মধ্য থেকে যা ধরে বন্টন করলে ওয়ারিসরা কম পায়, সেই প্রকার স্বত্ব তাদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি গর্ভস্থ সন্তানের জন্য রেখে দিতে হবে।

ইদ্দত পালনকারিণীর স্বত্ব ঃ যে স্ত্রীকে 'রিজয়ী' প্রকারের তালাক দেওয়া হয়েছে, যদিও রুজু করার এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে তার স্বামী মারা যায় তবে সে স্ত্রী এ স্বামীর ওয়ারিসী স্বত্বে অংশীদার হবে। কারণ, তার বিবাহ আইনত বহাল রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি রোগে আক্রান্ত অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়, যদি তা বায়েন অথবা চূড়ান্ত তালাক হয় এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে তালাকদাতা মারা যায়, তবে সে স্ত্রী তার ওয়ারিস হবে। তাকে ওয়ারিস করার জন্য দুটি ইদ্দতের মধ্যে যেটি দীর্ঘ, সেটিই অবলম্বন করা হবে। এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এই যে, তালাকের ইদ্দত তিন হায়েয এবং স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত চার মাস দশ দিন। এতদুভয়ের মধ্যে যে ইদ্দতটি বেশী দিনের হয়, সেটিকেই ইদ্দত সাব্যস্ত করা হবে, যাতে স্ত্রীর অংশীদার হওয়ার ব্যাপারটি যতদূর সম্ভব নিশ্চিত হয়ে যেতে পারে।

যদি কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই বায়েন অথবা চূড়ান্ত তালাক দিয়ে দেয় এবং কয়েকদিন পর স্ত্রীর ইদ্দত চলা অবস্থায় সে মারা যায়, তবে এমতাবস্থায় স্ত্রী ওয়ারিসী স্বত্ব পাবে না। তবে 'রিজয়ী' প্রকারের তালাক দিলে ওয়ারিস হবে।

মাস'আলা ঃ যদি কোন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে স্বেচ্ছায় 'খুলা' তালাক নিয়ে নেয়, তবে স্বামী ইদ্দতের মধ্যে মারা গেলেও সে ওয়ারিস হবে না।

আসাবাদের স্বত্ব ঃ ফরায়েযের নির্ধারিত অংশ বার জন ওয়ারিসের জন্য চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত। তাদেরকে 'আসহাবুল-ফুরূয' বলা হয়। তাদের কিছু বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি আসহাবুল-ফুরূযের মধ্য থেকে কেউ না থাকে কিংবা আসহাবুল ফুরূযের অংশ দেওয়ার পর কিছু সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে, তবে তা আসাবাদেরকে দেওয়া হয়। ক্ষেত্র বিশেষে একই ব্যক্তি উভয় দিক দিয়েই অংশ পেতে পারে। কোন কোন অবস্থায় মৃতের সন্তান এবং মৃতের পিতাও আসাবা হয়ে যায়। দাদার সন্তান অর্থাৎ চাচা এবং পিতার সন্তান অর্থাৎ ভাইও আসাবাভুক্ত হয়।

আসাবা কয়েক প্রকার। বিস্তারিত বিবরণ ফরায়েয গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। মনে করুন---স্ত্রী, কন্যা, মা ও চাচা---এই চারজন ওয়ারিস রেখে যায়েদ মারা গেল। এমতাবস্থায় তার সম্পত্তি মোট চব্বিশ ভাগে ভাগ করা হবে। অর্ধেক অর্থাৎ বারো ভাগ পাবে কন্যা, আট ভাগের একের হিসাবে তিন ভাগ পাবে স্ত্রী, ছয় ভাগের একের হিসাবে চার ভাগ পাবে মা এবং অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ আসাবা হওয়ার কারণে পাবে চাচা।

মাস'আলা ঃ যদি আসাবা না থাকে, তবে আসহাবে-ফরায়েযকে দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা তাদের অংশ অনুযায়ী পুনরায় তাদেরকেই দেওয়া হয়। ফরায়েযের পরিভাষায় একে 'রদ' বলা হয়। তবে স্বামী ও স্ত্রীর উপর রদ হয় না। তারা কোন অবস্থায়ই নির্ধারিত অংশের বেশী পায় না।

যদি আসহাবুল-ফুরূয ও আসাবা এতদুভয়ের মধ্যে কেউ না থাকে, তবে যাবিল-আরহাম ওয়ারিসী স্বত্ব লাভ করে। যাবিল আরহামের তালিকা দীর্ঘ। দৌহিত্র, দৌহিত্রী, বোনের সন্তানাদি, ফুফু, মামা, খালা---এরা যাবিল-আরহামের তালিকায় পড়ে। এর বিশদ বিবরণ ফিকহ্ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে।

وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً
مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ
اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ۝ وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ
تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

(১৫) আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসাবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন। (১৬) তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবূলকারী, দয়ালু।

যোগসূত্র ঃ জাহিলিয়াত যুগে ইয়াতীমদের সম্পর্কে এবং ওয়ারিসী স্বত্বের ক্ষেত্রে যে সব অসম ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেগুলোর সংস্কার সাধন করা হয়েছে। তারা নারীদের উপরও অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাতো এবং তাদের ব্যাপারে নানাবিধ কুপ্রথায় লিপ্ত ছিল। যে সব স্ত্রীলোককে বিয়ে করা বৈধ নয়,তারা তাদেরকেও বিয়ে করতো।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব বিষয়ের সংস্কার করা হচ্ছে এবং শরীয়তের আইনে অন্যায়---এমন কোন কাজ কোন স্ত্রী দ্বারা সংঘটিত হয়ে গেলে সেজন্য তাকে শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কুসংস্কার ও অন্যায়ের প্রতিবিধানের এই বিষয়বস্তু পরবর্তী দু'তিন রুকূ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমাদের (বিবাহিতা) নারীদের মধ্য থেকে যারা অশ্লীল কাজ (অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়) তোমরা তাদের (এ কাজের) বিপক্ষে নিজেদের মধ্য থেকে চারজন (অর্থাৎ মুসলমান মুক্ত, বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক, পুরুষ) সাক্ষী আন (যাতে তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী বিচারকরা পরবর্তী শাস্তি জারি করতে পারেন। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্যদান করে, তবে (তাদের শাস্তি এই যে,) তোমরা তাদেরকে (বিচারকের নির্দেশ অনুযায়ী) গৃহের মধ্যে (দৃষ্টান্তমূলকভাবে) আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত (হয়) মৃত্যু তাদের খতম করে দেয় (না হয়) কিংবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন পথ (অর্থাৎ পুনঃনির্দেশ) প্রদান করেন (পরে এ ব্যাপারে যে নির্দেশ প্রদান করা হয়, তা আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ে উল্লেখ করা হবে)। এবং (ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে বিবাহিতা স্ত্রীর কোন বিশেষত্ব নেই ; বরং) তোমাদের মধ্য থেকে (অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, মুসলমানদের মধ্য থেকে) যে কোন দু'ব্যক্তিই সে অশ্লীল কাজে (অর্থাৎ ব্যভিচারে) লিপ্ত হয় তাদের উভয়কে শাস্তি প্রদান কর। অনন্তর (শাস্তি প্রদানের পর) যদি তারা উভয়েই (অতীত কুকর্ম থেকে) তওবা করে নেয় এবং (ভবিষ্যতের জন্য) নিজেদের সংশোধন করে নেয় (অর্থাৎ পুনরায় এরূপ কুকর্ম তাদের দ্বারা সংঘটিত না হয়), তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। (কেননা,) নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবূলকারী, দয়ালু। (তাই আল্লাহ্ স্বীয় দয়া দ্বারা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কাজেই তোমাদেরও তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার ফিকিরে থাকা উচিত নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পুরুষ ও নারীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা নির্লজ্জ কাজ অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যেসব নারী দ্বারা এমন কুকর্ম সংঘটিত হয়, তাদের এ কাজ প্রমাণ করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষী তলব করতে হবে। অর্থাৎ যে সব বিচারকের কাছে এই মামলা পেশ করা হয়, তারা প্রমাণের জন্য চারজন যোগ্য সাক্ষী তলব করবেন এবং এই সাক্ষীদের পুরুষ শ্রেণীভুক্ত হওয়াও জরুরী। এ ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যভিচারের সাক্ষীদের ব্যাপারে শরীয়ত দু'রকম কঠোরতা করেছে। যেহেতু ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এতে ইজ্জত ও আবরু আহত হয় এবং পারিবারিক মান-সম্ভ্রমের প্রশ্ন দেখা দেয়, তাই প্রথমে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এমন ক্ষেত্রে শুধু পুরুষই সাক্ষী হতে হবে---নারীদের সাক্ষ্য ধর্তব্য নয়। দ্বিতীয়ত চারজন পুরুষ হওয়া জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ শর্তটি খুবই কঠোর। দৈবাৎ ও কদাচিৎ তা পাওয়া যেতে পারে। এ শর্ত আরোপের কারণ, যাতে স্ত্রীর স্বামী, তার জননী অথবা অন্য স্ত্রী অথবা ভাইবোন ব্যক্তিগত জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে অহেতুক অপবাদ আরোপ করার সুযোগ না পায় অথবা অন্য অমঙ্গলকারী লোকেরা শত্রুতাবশত অপবাদ আরোপ করতে সাহসী না হয়। কেননা, চারজন পুরুষ সাক্ষীর কমে ব্যভিচারের সাক্ষ্য দিলে তাদের সাক্ষী গ্রহণীয় নয়। এমতাবস্থয় বাদী সাক্ষীরা সব মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয় এবং একজন মুসলমানের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করার দায়ে তাদের 'হদ্দে-কযফ' বা অপবাদের শাস্তি ভোগে করতে হয়।

সূরা-নূরে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে ঃ

لَوْلَا جَاءُوْا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِنْ لَّمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ ۝

অর্থাৎ যারা ব্যভিচারের অভিযোগের সমর্থনে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, আল্লাহ্‌র কাছে তারা মিথ্যাবাদী।

কোন কোন বুযুর্গ চারজন পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তার কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ এ ব্যাপারে যেহেতু দু'ব্যক্তি জড়িত হয়, পুরুষ ও স্ত্রী, তাই একই ব্যাপার যেন দু'ব্যাপারের পর্যায়ভুক্ত। প্রত্যেক ব্যাপারে দু'জন সাক্ষী দরকার হয়। তাই এখানে চারজন সাক্ষী জরুরী হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ যদি তারা উভয়ে তওবা করে নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের থেকে নিবৃত্ত হও। এর অর্থ এই যে, শাস্তি দেওয়ার পর যদি তারা তওবা করে, তবে তাদেরকে তিরস্কার করো না এবং আরও শাস্তি দিয়ো না। এরূপ অর্থ নয় যে, তওবা দ্বারা শাস্তি মওকুফ হয়ে যাবে। কারণ, আয়াতে শাস্তির পরে তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ; 'ফা' অক্ষর থেকে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। হ্যাঁ, যদি তওবা না করে, তবে শাস্তির পরও তিরস্কার করা যায়।

কোরআন পাকের এ দু'আয়াতে ব্যভিচারের কোন নির্দিষ্ট হদ বা শাস্তি বর্ণিত হয়নি ; বরং শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, তাদেরকে যন্ত্রণা দাও এবং ব্যভিচারিণী নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ।

যন্ত্রণা দানের বিশেষ কোন পন্থাও ব্যক্ত করা হয়নি, বরং বিচারকদের মতামতের উপরই তা ন্যস্ত করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এখানে যন্ত্রণা দানের অর্থ তাদেরকে মৌখিক লজ্জা দেওয়া, শরমিন্দা করা এবং হাত বা জুতা ইত্যাদি দ্বারা প্রহার করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর এ উক্তিও দৃষ্টান্তমূলক মনে হয়। আসল ব্যাপার তাই যে, ব্যাপারটি বিচারকের মতামতের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

অবতরণের দিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ক্রম এরূপ যে, শুরুতে তাদেরকে যন্ত্রণাদানের নির্দেশ নাযিল হয়েছে। এরপর বিশেষভাবে নারীদের জন্য এ বিধান বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে, যে পর্যন্ত তারা মারা না যায়। তাদের জীবদ্দশাতেই পুনরাদেশ এসে গেলে 'হদ' হিসাবে তাই প্রয়োগ করা হবে।

সেমতে পরবর্তীকালে এ আয়াতে প্রতিশ্রুতি سبيل বা পথ বলে দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ 'পথের' তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ يعنى الرجم للثيّب والجلد للبكر অর্থাৎ বিবাহিত ব্যক্তির জন্য প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা এবং অবিবাহিতের জন্য বেত্রদণ্ড। ---(বুখারী)

'মরফু' হাদীসসমূহেও এ 'পথের' বর্ণনা রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং বিবাহিত ও অবিবাহিত প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) মায়েয ইবনে মালেক (রা) ও ইযদ গোত্রের জনৈকা মহিলার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তারা উভয়েই বিবাহিত ছিল বিধায় তাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা হয়েছিল। এছাড়া জনৈক ইহুদীকেও ব্যভিচারের কারণে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা হয়েছিল। তার জন্য এ ফয়সালা করা হয়েছিল তওরাতের নির্দেশ মোতাবেক।

অবিবাহিতের বিধান স্বয়ং কোরআন-পাকে সূরা নূরে উল্লিখিত আছে ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

'ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ এতদুভয়ের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত কর।'

শুরুতে প্রস্তর বর্ষণের বিধানের জন্য কোরআন-পাকে আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছিল ; কিন্তু পরবর্তীকালে তার তিলাওয়াত রহিত করে বিধান বাকী রাখা হয়।

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ

ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله تعالى اية الرجم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده والرجم فى كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء ...

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য নবী রূপে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি কিতাবও নাযিল করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ যে সব ওহী নাযিল করেছেন, তন্মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যার আয়াতও ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রস্তর বর্ষণ করেছেন এবং তৎপরবর্তীকালে আমরাও প্রস্তর বর্ষণ করেছি। প্রস্তর বর্ষণের বিধান সে ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট, যে বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়---পুরুষ হোক কিংবা নারী।

---(বুখারী)

মোট কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের বর্ণিত গৃহে আবদ্ধ করা ও যন্ত্রণা দেওয়ার বিধান শরীয়তের হদ বা শাস্তি নাযিল হওয়ার পর রহিত হয়ে যায়। এখন ব্যভিচারের শাস্তি একশ' বেত্রাঘাত কিংবা প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই অপরিহার্য হবে। আরও বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ সূরা-আন নূরের তফসীরে বর্ণিত হবে।

অস্বাভাবিক পন্থায় কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার শাস্তি ঃ কাযী সানাউল্লাহ্ পানীপথী (র) তফসীরে মাযহারীতে লেখেন ঃ আমার মতে اَللَّذَانِ يَاْتِيَانِهَا বলে সে সব লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা অস্বাভাবিক পন্থায় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে অর্থাৎ সমকামে লিপ্ত হয়।

কাজী সাহেব ছাড়াও অন্য আরো কিছুসংখ্যক তফসীরবিদ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কোরআনের ভাষায় اللذان يأتيانها বাক্যে موصول ও صلة উভয়টি পুংলিঙ্গ। তাই তাদের এ উক্তি অবান্তর নয়। যারা এখানে ব্যভিচারী নারী অর্থ করেছেন, তারা تغليب-এর নীতি অনুযায়ী পুংলিঙ্গ পদের মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গকেও শামিল রেখেছেন। এতদসত্ত্বেও স্থানের সাথে মিল থাকার কারণে সমকামের অবৈধতা, জঘন্যতা এবং এর শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

হাদীস ও ইমামদের উক্তি থেকে এ ব্যাপারে যা কিছু প্রমাণিত হয়, তা থেকে নমুনা হিসাবে নিম্নে কিছুটা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

عن ابى هريرة (رض) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع سمواته وردّد اللّعنة على واحد منهم ثلاثاً ولعن كلّ واحد منهم لعنة تكفيه قال ملعون من عمل عمل قوم لوط - ملعون من عمل عمل قوم لوط - ملعون من عمل عمل قوم لوط o

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্ট জীবের মধ্য থেকে সাত প্রকার লোকের প্রতি সপ্ত আকাশের উপর থেকে অভিসম্পাত করেছেন। তাদের মধ্যে একজনের প্রতি তিন তিনবার অভিসম্পাত করেছেন এবং অবশিষ্টদের প্রতি একবার! তিনি বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কওমে লূতের অনুরূপ

কুকর্ম করে, ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কওমে লূতের অনুরূপ কুকর্ম করে, ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কওমে লূতের অনুরূপ কুকর্ম করে। —(তারগীব ও তারহীব)

عن ابى هريرة (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اربعة يصبحون فى غضب الله ويمسون فى سخط الله - قلتُ من هم يا رسول الله قال المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وَالذى ياتى البهيمة والذى يَاتى الرجال -

—হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ চার ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্র গযবে পতিত থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহ্র রসূল! তারা কারা? তিনি বললেন ঃ ঐ সকল পুরুষ, যারা স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করে এবং ঐ সকল স্ত্রীলোক, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং ঐ ব্যক্তি, যে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে যৌনক্রিয়া সম্পাদন করে এবং ঐ ব্যক্তি, যে পুরুষের সাথে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। —(তারগীব ও তারহীব)

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা কোন লোককে কওমে লূতের ন্যায় অস্বাভাবিক কর্ম করতে দেখলে তাকে ও যার সাথে এ অপকর্ম করা হয়, উভয়কে কতল করে দাও। —(তারগীব ও তারহীব)

হাফেয যকিউদ্দীন তারগীব ও তারহীব গ্রন্থে লেখেন ঃ চার খলীফা—হযরত আবূ বকর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা) এবং হিশাম ইবনে আবদুল মালিক নিজ নিজ খিলাফতকালে অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়ায় জড়িত ব্যক্তিদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিলেন।

এ সম্পর্কে তিনি মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদিরের রেওয়ায়েতক্রমে একটি ঘটনাও উল্লেখ করেছেন যে, খালেদ ইবনে ওলীদ (রা) একবার হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে এই মর্মে এক পত্র লিখেন যে, এখানে আরবের এক এলাকায় একজন পুরুষ রয়েছে, যার সাথে নারীদের অনুরূপ যৌনক্রিয়া করা হয়।

হযরত আবূ বকর (রা) সাহাবায়ে-কিরামকে একত্রিত করে এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করেন। পরামর্শদাতাদের মধ্যে হযরত আলী (রা)-ও উপস্থিত হন এবং তিনি বলেন ঃ এ গোনাহ্টি একটি জাতি ব্যতীত অন্য কেউ করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা সে জাতির সাথে কি ব্যবহার করেছেন, তা আপনাদের সবার জানা আছে। আমার অভিমত এই যে, তাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হোক। অন্যান্য সাহাবায়ে-কিরামও এর সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। সেমতে হযরত আবূ বকর (রা) তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেন।

উল্লিখিত রেওয়ায়েতসমূহে বারবার কওমে-লূতের কুকর্মের কথা বলা হয়েছে। হযরত লূত (আ) যে জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা কুফ্‌র ও শির্‌ক ছাড়াও এই জঘন্যতম অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত ছিল। লূত (আ)-এর দাওয়াত ও প্রচারে তারা যখন মোটেই প্রভাবান্বিত হলো না, তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফেরেশতারা তাদের জনপদ-গুলোকে উপরে তুলে সম্পূর্ণ উল্টে মাটিতে নিক্ষেপ করে। সূরা আ'রাফে এ সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

উপরোক্ত রেওয়ায়েতগুলো হচ্ছে সমকামের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কোন কোন রেওয়া-য়েতে নারীদের সাথে অস্বাভাবিক কাজ করার জন্যও কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

عن ابن عباس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل الى رجل اتى رجلا او امرأة فى دبرها -

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়ার দৃষ্টি দেন না, যে পুরুষ কিংবা নারীর সাথে অস্বা-ভাবিক কর্ম করে। ---(তারগীব ও তারহীব)

عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحيى من الحق ثلاث مرات لا تأتوا النساء فى ادبارهن -

অর্থাৎ খুযায়মা ইবনে সাবেত বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেন না। এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। (অতঃপর বললেন ঃ) তোমরা নারীদের সাথে পশ্চাৎদ্বার দিয়ে উপগত হয়ো না।
---(তারগীব ও তারহীব)

عن ابى هريرة (رض) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من اتى امرأة فى دبرها -

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, অস্বাভাবিক পন্থায় যে (পশ্চাৎদ্বারে) স্ত্রীর সাথে সহবাস করে।
---(তারগীব ও তারহীব)

وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضاً او امرأةً فى دبرها او كاهناً فصدّقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ٥

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে পুরুষ হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অথবা অস্বাভাবিক পন্থায় স্ত্রীগমন করে অথবা কোন অতীন্দ্রিয়বাদী গণকের কাছে গমন করে, অতঃপর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তার সংবাদকে সত্য মনে করে, সে ঐ ধর্মকে অস্বীকার করে, যা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

এ কুকর্মের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারণের ব্যাপারে ফিকহ্‌বিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, যা ফিকহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। মোট কথা, ফিকহ্‌র কিতাবে এর জন্য কঠোরতর শাস্তির কথা বর্ণিত আছে। উদাহরণত আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া, দেয়ালচাপা দিয়ে পিষে দেওয়া, উঁচু জায়গা থেকে নীচে ফেলে দিয়ে প্রস্তর বর্ষণ করা, তরবারি দ্বারা হত্যা করা ইত্যাদি।

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ
مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ
أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

(১৭) অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের তওবা কবূল করবেন, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে ; এরাই হল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। (১৮) আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারও মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে ঃ আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে তওবার কথা এসেছিল। এখন আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তওবা কবূলের শর্তসমূহ এবং কবূল হওয়া না হওয়ার অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তওবা (ওয়াদা অনুযায়ী কবূল করা) আল্লাহ্‌র দায়িত্ব, তা তো তাদেরই, যারা নির্বুদ্ধিতা বশত কোন গোনাহ্ (সগীরা হোক বা কবীরা) করে বসে, অতঃপর যথাশীঘ্র (অর্থাৎ মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পূর্বে, যার অর্থ পরে বর্ণিত হবে) তওবা করে নেয়। অতএব, এমন লোকদের প্রতি তো আল্লাহ্ (তওবা কবূল করার জন্য) মনোনিবেশ করেন

(অর্থাৎ তওবা কবুল করে নেন) এবং আল্লাহ্ খুব জানেন (যে, কে মনে প্রাণে তওবা করেছে), তিনি রহস্যবিদ (যারা মনে প্রাণে তওবা করে না, তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন না)। আর তাদের তওবা (কবুলই) হয় না, যারা (অনবরত) গোনাহ্ করতে থাকে; এমনকি, যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু এসে দাঁড়ায় (মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার অর্থ এই যে, পরজগতের দৃশ্যাবলী তার দৃষ্টিগোচর হতে থাকে) তখন বলতে থাকে ঃ আমি এখন তওবা করছি (অতএব, না তাদের তওবা কবুল হয়,) আর না তাদের (তওবা অর্থাৎ তখন ঈমান আনা মকবুল হয়) যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তাদের (কাফিরদের) জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (অর্থাৎ দোযখের আযাব) প্রস্তুত করে রেখেছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত গোনাহ্ মাফ হয় কি না ঃ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোরআন পাকে بِجَهَالَةٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায়, অজ্ঞাতসারে এবং না জেনে-শুনে গোনাহ্ করলে তওবা কবুল হবে এবং জ্ঞাতসারে জেনে-শুনে গোনাহ্ করলে তওবা কবুল হবে না। কিন্তু সাহাবায়ে-কিরাম এ আয়াতের যে তফসীর করেছেন তা এই যে, এখানে جَهَالَةٍ এর অর্থ এই নয় যে, সে গোনাহ্র কাজটি যে গোনাহ্ তা জানে না কিংবা গোনাহ্র ইচ্ছা নেই; বরং অর্থ এই যে, গোনাহ্র অশুভ পরিণাম ও পারলৌকিক আযাবের প্রতি তার সাময়িক অনীহাই তার গোনাহ্র কাজ করার কারণ; যদিও গোনাহ্টি যে গোনাহ্, তা সে জানে এবং তার ইচ্ছাও করে।

পক্ষান্তরে جَهَالَةٍ শব্দটি এখানে 'নির্বুদ্ধিতা' ও 'বোকামি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ইউসুফে এর নযীর বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ) ভাইদেরকে বলেছিলেন ঃ

هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ○—এতে

ভাইদেরকে জাহিল বলা হয়েছে, অথচ তারা যে কাজ করেছিল, তা কোন ভুল অথবা ভুলে যাওয়া বশত ছিল না; বরং ইচ্ছাকৃতভাবে, জেনে-শুনেই করেছিল। কিন্তু এ কাজের পরিণতি সম্পর্কে গাফিল হওয়ার কারণে তাদেরকে জাহিল বলা হয়েছে।

আবুল-আলিয়া ও কাতাদাহ্র বর্ণনা মতে সাহাবায়ে-কিরাম এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة عمدًا كان أو غيره—অর্থাৎ বান্দা যে গোনাহ্ করে—অনিচ্ছাকৃতভাবে করুক কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে, সর্বাবস্থায়ই তা মূর্খতা।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কাজে আল্লাহ্র নাফরমানী করছে, সে দৃশ্যত বড় আলিম ও বিশেষ জানাশোনা বিচক্ষণ হলেও সে কাজ করার সময় মূর্খই বটে।—(ইবনে-কাসীর)

আবূ হাইয়্যান তফসীরে বাহরে-মুহীতে বলেন ঃ এটা এমনই, যেমন হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لَا يَزْنِى الزَّانِى وَهُوَ مُؤْمِن অর্থাৎ ব্যভিচারী ঈমানদার অবস্থায় ব্যভিচার করে না। উদ্দেশ্য এই যে, যখন সে এই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তখন সে ঈমানের তাকীদ থেকে দূরে সরে পড়ে।

তাই হযরত ইকরিমা বলেন ঃ اُمُوْرُ الدُّنْيَا كُلُّهَا جَهَالَةٌ—অর্থাৎ দুনিয়ার যেসব কাজ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বাইরে, সেগুলো সবই মূর্খতা। কারণ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে, সে ক্ষণস্থায়ী সুখকে চিরস্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। যে ব্যক্তি এই ক্ষণস্থায়ী সুখের বিনিময়ে চিরস্থায়ী কঠোর আযাব ক্রয় করে, তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। তাকে সবাই মূর্খ বলবে, যদিও সে ভালভাবে জানা ও বোঝার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে সে কুকর্ম সম্পাদন করে।

মোট কথা, গোনাহ্‌র কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা হোক কিংবা ভুলক্রমে—উভয় অবস্থাতেই তা মূর্খতাবশত সম্পন্ন হয়। এ কারণেই সাহাবা, তাবেয়ীন ও সমগ্র উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গোনাহ্ করে, তার তওবাও কবূল হতে পারে। —(বাহরে-মুহীত)

আলোচ্য আয়াতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এতে তওবা কবূল হওয়ার জন্য শর্ত রাখা হয়েছে যে, যথাশীঘ্র বা কাছাকাছি সময়ে তওবা করতে হবে। তওবা করায় দেরী করা যাবে না। প্রশ্ন এই যে, এখানে 'যথাশীঘ্র' বলে কতটুকু সময় বোঝানো হয়েছে ? রসূলুল্লাহ্ (সা) এক হাদীসে স্বয়ং এর তফসীর করেছেন। তিনি বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ—হাদীসের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তওবা তখন পর্যন্ত কবূল করেন, যে পর্যন্ত তার উপর মৃত্যু যন্ত্রণার গরগরা প্রকাশ না পায়।

মুহাদ্দিস ইবনে মরদুইয়াহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ মু'মিন বান্দা যদি মৃত্যুর এক মাস অথবা একদিন অথবা এক মুহূর্ত পূর্বেও গোনাহ্ থেকে তওবা করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবাও কবূল করবেন ; যদি আন্তরিকতা সহকারে খাঁটি তওবা করা হয়। —(ইবনে কাসীর)

মোট কথা, রসূলুল্লাহ্ (সা) مِنْ قَرِيْبٍ-এর যে তফসীর করেছেন, তা থেকে জানা গেল যে, মানুষের সমগ্র জীবনকালই নিকটবর্তীর অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যে তওবা করা হবে, তা কবূল হবে। তবে মৃত্যুর গরগরার সময় যে তওবা করা হবে, তা কবূল হবে না।

হাকীমুল-উম্মত হযরত মওলানা থানবী (র) তফসীরে বয়ানুল-কোরআনে এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে দু'রকম অবস্থা দেখা দেয়। একটি হল নৈরাশ্যের অবস্থা। তখন মানুষ প্রত্যেক চিকিৎসা ও তদবীর থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং মনে করে যে, এখন মৃত্যু সমাগত। একে يَاس (বা'স)-এর অবস্থা বলা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় অবস্থা এর পরে আসে, যখন মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় এবং উর্ধ্বশ্বাস শুরু হয়ে যায়। এ অবস্থাকে 'ইয়াস' বলা হয়। প্রথমোক্ত অবস্থা অর্থাৎ 'বাস'-এর অবস্থা পর্যন্ত সময় তো من قريب-এরই অন্তর্ভুক্ত এবং তখনকার তওবাও কবুল হয়, কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ 'ইয়াস'-এর অবস্থায় যে তওবা করা হয়, তা কবুল হয় না। তখন ফেরেশতা এবং পরজগতের দৃশ্যাবলী মানুষের দৃষ্টির সামনে এসে যায়। বস্তুত, এটা من قريب-এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ আয়াতে من قريب শব্দটি সংযোজন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের সমগ্র জীবনই স্বল্পকাল এবং যে মৃত্যুকে সে দূরে মনে করছে, তা অতি নিকটে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত قريب-এর তফসীরের প্রতি অন্য এক আয়াতে স্বয়ং কোরআনও ইঙ্গিত করেছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ মৃত্যুর সময়কার তওবা মকবুল হয় না।

আয়াতের বিষয়বস্তুর সারমর্ম হলো এই যে, যে ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করে---বুঝে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে করুক কিংবা ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত করুক, তা সর্বাবস্থায় মূর্খতাই বটে। এমন প্রত্যেক গোনাহ্ থেকে মানুষের তওবা কবুল করার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। তবে শর্ত এই যে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সত্যিকারভাবে তওবা করতে হবে।

'তাদের তওবা কবুল করার দায়িত্ব আল্লাহ্র'---এ কথার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন, যা পূর্ণ হওয়া নিশ্চিত। নতুবা আল্লাহ্র যিম্মায় কোন ফরয, ওয়াজিব অথবা কারও হক প্রাপ্য হয় না। প্রথম আয়াতে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে ঐ তওবার কথা বলা হচ্ছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

এতে বলা হয়েছে ঃ তাদের তওবা কবুলযোগ্য নয়, যারা সারা জীবন নির্ভয়ে গোনাহ্ করতে থাকে আর মৃত্যু যখন মাথার উপর ছায়াপাত করে এবং মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় ও ফেরেশতা দৃষ্টিগোচর হয়, তখন বলে ঃ আমরা এখন তওবা করছি। তারা জীবনের সুযোগ অযথা ব্যয় করে তওবার সময় হারিয়ে ফেলে। তাই তাদের তওবা কবুল হবে না; যেমন ফেরাউন ও ফেরাউনের সভাসদরা সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার সময় চিৎকার করে বলেছিল ঃ আমরা মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি। তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ ঈমানের সময় চলে যাওয়ার পর এখন ঈমান আনায় কোন ফায়দা নেই।

আয়াতের শেষ বাক্যে এ বিষয়টিই বলা হয়েছে যে, তাদের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়, যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং ঠিক মৃত্যু-যন্ত্রণার সময় ঈমানের স্বীকারোক্তি করে। এ স্বীকারোক্তি ও ঈমান অসময়োচিত, অর্থহীন। তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে আযাব।

তওবার সংজ্ঞা ও তাৎপর্য ঃ আয়াতদ্বয়ের শাব্দিক তফসীরের পর তওবার সংজ্ঞা, স্বরূপ ও স্তর বর্ণনা করা জরুরী মনে হচ্ছে।

ইমাম গাযালী 'ইহইয়াউল-উলূম' গ্রন্থে বলেন ঃ গোনাহ্র তিনটি স্তর রয়েছে ঃ

এক—কোনো সময়ই কোনো গোনাহ্ না করা। এটা ফেরেশতা কিংবা পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য। দুই—গোনাহ্ করা এবং অব্যাহতভাবে করে যাওয়া। কোন সময় অনুশোচনা না করা এবং তা ত্যাগ করার কথা চিন্তা না করা। এ স্তর শয়তানদের। তৃতীয় স্তর মানবজাতির। অর্থাৎ গোনাহ্ হয়ে গেলে অবিলম্বে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা বর্জন করতে কৃতসংকল্প হওয়া।

এতে বোঝা গেল যে, গোনাহ্ হয়ে যাওয়ার পর তওবা না করা শয়তানের কাজ। তাই উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্যে তওবা করা ফরয। কোরআন পাক বলে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ -

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র কাছে তওবা কর—সত্যিকার তওবা। আশ্চর্য নয় যে, আল্লাহ্ তোমাদের গোনাহ্সমূহ মিটিয়ে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার দয়ার মহিমা দেখুন! মানুষ সারা জীবন তাঁরই নাফরমানীতে লিপ্ত থেকেও মৃত্যুর পূর্বে সর্বান্তকরণে তওবা করলে তিনি শুধু তার দোষই ক্ষমা করে দেন না, বরং তাকে প্রিয় বান্দাদের তালিকাভুক্ত করে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন!

হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

التائب حبيب الله - التائب من الذنب كمن لا ذنب له—অর্থাৎ তওবাকারী আল্লাহ্র প্রিয়। যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে তওবা করে, সে এমন হয়ে যায়, যেন গোনাহ্ করেনি।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, বান্দা যখন কোন গোনাহ্ থেকে তওবা করে এবং তার তওবা আল্লাহ্র কাছে কবুল হয়ে যায়, তখন সে গোনাহ্র জন্য শুধু যে তাকে পাকড়াও করা হয় না তাই নয়, বরং গোনাহ্টি ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামা থেকেও মিটিয়ে ফেলা হয়, যাতে সে অপমানের সম্মুখীনও না হয়।

তবে তওবা 'তওবায়ে-নসূহ' তথা নির্ভেজাল হওয়া জরুরী। নির্ভেজাল তওবার তিনটি স্তর রয়েছে।

এক—স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া। হাদীসে আছে ঃ انما التوبة الندم অর্থাৎ অনুতাপকেই তওবা বলা হয়।

দুই—কৃত গোনাহ অবিলম্বে বর্জন করা এবং ভবিষ্যতেও তা থেকে বিরত থাকার পাকাপোক্ত সংকল্প করা।

তিন---ক্ষতিপূরণের চিন্তা করা। অর্থাৎ যে গোনাহ্ হয়ে গেছে, সাধ্যানুযায়ী তার প্রতিকার করা। উদাহরণত নামায রোযা কাযা হয়ে থাকলে তার কাযা করা। পরিত্যক্ত নামায ও রোযার সঠিক সংখ্যা জানা না থাকলে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে তা অনুমানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করবে। অতঃপর সেগুলোর কাযা করতে যত্নবান হবে। এক সময়ে করতে না পারলে প্রত্যেক নামাযের সাথে এক এক নামাযের 'ওমরী-কাযা' পড়বে। এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে রোযার কাযার প্রতি যত্নবান হবে। ফরয যাকাত অনাদায়ী থাকলে বিগত দিনের যাকাতও একমুঠে অথবা কিস্তিতে কিস্তিতে আদায় করবে। কারও হক আত্মসাৎ করে থাকলে তা ফেরত দেবে। কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার কাছে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু যদি কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ না হয়, কিংবা অনুতাপ হলেও ভবিষ্যতে সে গোনাহ্ বর্জন করা না হয়, তবে তা তওবা নয় ; যদিও মুখে হাজার বার তওবা তওবা করে।

উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী যখন কেউ তওবা করে নেয়, তখন সর্বপ্রকার গোনাহ্ করা সত্ত্বেও সে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হয়ে যায়।

যদি মনুষ্যসুলভ দুর্বলতার কারণে পুনরায় কোন সময় সে গোনাহ্ করে ফেলে, তবে অবিলম্বে পুনরায় নতুন তওবা করে নেবে এবং পরম করুণাময়ের দরবার থেকে প্রত্যেকবার তওবা কবুলের আশা রাখবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ۭ
وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ
فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـــًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝ وَاِنْ
اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا
تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـــًٔا ۭ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝ وَكَيْفَ
تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

(১৯) হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না, যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তার কিয়দংশ নিয়ে নাও ; কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে! নারীদের সাথে

সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ রেখেছেন। (২০) যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রীর পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর, এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গোনাহর মাধ্যমে গ্রহণ করবে? (২১) তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমাদের একজন অন্যজনের কাছে গমন এবং নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।

যোগসূত্র ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে প্রসঙ্গক্রমে তওবার কথা আলোচিত হয়েছিল। এর পূর্বে নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বর্ণিত হচ্ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহেও নারী সম্পর্কিত বিধানাবলী ব্যক্ত হয়েছে। জাহিলিয়াত আমলে নারীদের উপর স্বামীদের পক্ষ থেকেও উৎপীড়ন হতো এবং ওয়ারিসদের পক্ষ থেকেও।

কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে ওয়ারিসরা তার সাথে যদৃচ্ছা ব্যবহার করতো। মন চাইলে নিজেই তাকে বিয়ে করে নিত কিংবা অপরের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করে দিত। মনে না চাইলে নিজেও বিয়ে করতো না, অপরের কাছে বিয়ে বসতেও বাদ সাধতো এবং তাদেরকে বন্দী করে রাখতো, যাতে অর্থোপার্জনের পথ প্রশস্ত হয়। কেননা, এমতাবস্থায় হয় তারা নিজস্ব ধন-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিত, না হয় তাদের গৃহেই বন্দী জীবন-যাপন করতে হতো এবং এভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হতো।

স্বামীরাও স্ত্রীদের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাতে দ্বিধা করতো না। মনে না চাইলে তাদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্কও স্থাপন করতো না এবং তালাকও দিতো না, যাতে সে অর্থকড়ি দিয়ে তালাক অর্জন করে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব অনিষ্টেরই মূলোৎপাটন করা হয়েছে। عَاشِرُوهُنَّ বলে বিশেষভাবে স্বামীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ থেকে مِّيثَاقًا غَلِيظًا পর্যন্ত আয়াত দুটিও এ বিষয়-বস্তুরই পরিশিষ্ট।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, নারীদের (জান ও মালের) বলপূর্বক মালিক হয়ে যাও। (মালের মালিক হওয়া তিন প্রকার। এক—ওয়ারিসী স্বত্বে নারীর প্রাপ্য হ্রাস করা—তাকে না দেওয়া। দুই—তাকে অন্যত্র বিয়ে না দেওয়া, যাতে সে এখানেই মারা যায় এবং তার ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করা যায় কিংবা নিজেই কিছু দিতে বাধ্য হয়। তিন—স্বামী তাকে অহেতুক বাধ্য করবে, যাতে তাকে কিছু ধন-সম্পদ দেয় এবং বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেয়।

প্রথম ও তৃতীয় প্রকারে 'বলপূর্বক' বলার তাৎপর্য এই যে, নারীর সম্মতিক্রমে এসব কাজ সম্পন্ন হলে তা বৈধ ও হালাল। দ্বিতীয় প্রকারে এ বল প্রয়োগ বাস্তবে বিয়েতে বাধাদানের জন্য। এর উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ গ্রহণ করা। তাই শব্দগতভাবে এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। এর তাৎপর্যও তাই। অর্থাৎ নারী স্বেচ্ছায় বিয়ে না করলে তাদের কোন গোনাহ নেই।

জানের মালিক হওয়ার অর্থ এই যে, তারা মৃতের স্ত্রীকে মৃতের ধন-সম্পদের মত ওয়ারিসী সম্পত্তি মনে করতো। এমতাবস্থায় 'বলপূর্বক' কথাটি বাস্তবসম্মত। অর্থাৎ তারা যে এরূপ করতো একথা বর্ণনা করার জন্য। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, নারীরা স্বেচ্ছায় মৃতের ধন-সম্পত্তির মত নিজেকে ত্যাজ্য সম্পত্তি করে নিলে সত্যি সত্যি ত্যাজ্য সম্পত্তি হয়ে যাবে।) এবং নারীদেরকে এ উদ্দেশ্যে আবদ্ধ করো না যেন যা কিছু তোমরা (অর্থাৎ স্বয়ং তোমরা কিংবা তোমাদের স্বজনরা) তাদেরকে প্রদান করেছ, তার কোন অংশ (-ও তাদের কাছ থেকে) আদায় করে নাও। (এ বিষয়বস্তুটিও তিন প্রকার। এক—মৃতের ওয়ারিস মৃতের স্ত্রীকে বিয়ে করতে দেবে না, যাতে স্ত্রী তাকে কিছু দেয়। দুই—স্বামী তাকে বাধ্য করবে যে, আমাকে কিছু দিলে আমি ছেড়ে দেব। তিন—তালাক দেওয়ার পরও স্বামী কিছু ঘুষ ছাড়া তাকে অন্যত্র বিয়ে বস্‌তে দেবে না। এখানকার প্রথম প্রকার বিষয় পূর্ববর্তী দ্বিতীয় প্রকার বিষয়টির একটি অংশ এবং এখানকার দ্বিতীয় প্রকার বিষয় হুবহু পূর্ববর্তী তৃতীয় প্রকার বিষয়ের অনুরূপ। পূর্ববর্তী প্রথম প্রকার বিষয় এবং এখানকার তৃতীয় প্রকার বিষয় পৃথক) কিন্তু (কোন কোন অবস্থায় তাদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করা কিংবা তাদেরকে আটক করা বৈধ। তা এই যে,) নারীরা যদি কোন গর্হিত কাজ করে। (এতেও তিন অবস্থা রয়েছে। এক—গর্হিত কাজটি হবে স্বামীর প্রতি অবাধ্যতা ও চরিত্রহীনতা। এমতাবস্থায় অর্থ গ্রহণ ব্যতিরেকে, যা মোহরানার চাইতে বেশী হবে না—স্ত্রীকে আটক রাখতে পারে। দুই—গর্হিত কাজটি হবে ব্যভিচার। ইসলামের প্রথম যুগে ব্যভিচারের শাস্তি অবতরণের পূর্বে এ অপরাধের কারণে স্বামীর জন্য নিজের দেয়া অর্থ-সম্পদ ফেরত গ্রহণ করে স্ত্রীকে বহিষ্কার করা বৈধ ছিল। এখন এ বিধান রহিত হয়ে গেছে। ব্যভিচারের কারণে মোহরানার অপরিহার্যতা নষ্ট হয় না। উপরোক্ত উভয় অবস্থায় অর্থ গ্রহণ করা যাবে। তিন—গর্হিত কাজটি ব্যভিচার হলে স্বামীর জন্য এবং অন্য ওয়ারিসদের জন্য শাস্তি হিসাবে বিচারকের আদেশে স্ত্রীদেরকে গৃহমধ্যে আটক রাখা বৈধ ছিল; যেমন রুকূর শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর এ বিধানও রহিত হয়ে গেছে। অতএব এ আটক রাখা হবে শাস্তি হিসাবে, অর্থ আদায় করার উদ্দেশ্যে নয়। সুতরাং إِلَّا এর মাধ্যমে যে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে, তা হবে—সাধারণ عضل তথা আটক রাখা থেকে শর্তযুক্ত আটক রাখা অর্থাৎ অর্থ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আটক রাখা থেকে নয়। এরপর বিশেষভাবে স্বামীদেরকে আদেশ করা হচ্ছে—) এবং স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর (অর্থাৎ সচ্চরিত্রতা ভরণ-পোষণের ও দেখা-শোনার মাধ্যমে) এবং যদি (মনের চাহিদা অনুযায়ী) তারা তোমাদের পছন্দ না হয়

(কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে অপছন্দের কোন কারণও না ঘটে), তবে (তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধির তাকীদ মেনে নিয়ে এমন চিন্তা করে সহ্য কর যে,) সম্ভবত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, আল্লাহ্ তা'আলা যার মধ্যে (জাগতিক অথবা পারলৌকিক) বড় রকমের কোন কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। (উদাহরণত তারা তোমাদের সেবিকা, সুখ বিধানকারিণী ও সহানুভূতিশীলা হবে। এটা পার্থিব উপকার। অথবা কমপক্ষে অপছন্দনীয় বস্তুর জন্য সবর করার সওয়াব ও ফযীলত তো অবশ্যই পাওয়া যাবে।) আর যদি তোমরা (আগ্রহাতিশয্যের কারণে) এক স্ত্রীর স্থলে (অর্থাৎ প্রথম স্ত্রীর স্থলে) অন্য স্ত্রীর পরিবর্তন করতে চাও (এবং প্রথম স্ত্রীর কোন দোষ না থাকে) এবং তোমরা একজনকে (মোহরানায় কিংবা এমনিতেই দান-বখশিশ হিসাবে) প্রচুর অর্থ দিয়ে থাক (হাতে সমর্পণ করে থাক কিংবা বিশেষ মোহরানার জন্য চুক্তিপত্রে দেওয়া সাব্যস্ত করে থাক), তবে (অর্থাৎ প্রদত্ত কিংবা চুক্তিবদ্ধ অর্থ) থেকে (স্ত্রীকে বিরক্ত করে) কিছুই (ফেরত) গ্রহণ করো না। (বস্তুত ক্ষমা করানোও কার্যত ফেরত নেওয়ারই অন্যরূপ।) তোমরা কি তা (ফেরত) গ্রহণ করবে (তার উপর অবাধ্যতা কিংবা অশ্লীলতার) অপবাদ আরোপের মাধ্যমে কিংবা (তার অর্থ সম্পদে) প্রকাশ্য গোনাহ্ (অর্থাৎ উৎপীড়ন) করে? (অপবাদ প্রকাশ্য হোক কিংবা অর্থগত হোক। পূর্বে শুধু অবাধ্যতা ও কুকর্মের অবস্থায় তার কাছ থেকে অর্থ গ্রহণের অনুমতি ছিল। কাজেই তার কাছ থেকে যখন অর্থ গ্রহণ করা হবে, তখন যেন তাকে অপরের দৃষ্টিতে অবাধ্যকারিণী ও কুকর্মীরূপেই চিত্রিত করা হল। আর্থিক জুলুমের কারণ সুস্পট যে, মনের খুশীতে স্ত্রী তার সে অর্থ দিয়ে থাকে। আর দান করার ক্ষেত্রে এটা এজন্য জুলুম হবে যে, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর একজন অন্যজনকে হাদিয়া দিলে শরীয়তের আইনে তা ফেরত গ্রহণের অধিকার কারোই থাকে না। সুতরাং ফেরত নিলে তা এক প্রকার ছিনতাই হবে। বস্তুত আরোপের প্রয়োজনীয়তাও এ থেকেই দেখা দেয়। কেননা, ফেরত গ্রহণ করার মানে যেন একথা বলা যে, সে আমার স্ত্রী ছিল না। এটা যে অপবাদ তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, এতে স্ত্রী বিবাহের দাবীতে মিথ্যাবাদিনী এবং সমাজে পাপাচারিণী সাব্যস্ত হয়।) এবং তোমার প্রদত্ত এ অর্থ (সত্যিকারভাবে অথবা বিধিগতভাবে) কিরূপে গ্রহণ করবে, অথচ (অপবাদ ও জুলুম ছাড়া একে গ্রহণ করার মধ্যে আরও দু'টি বাধা রয়েছে! এক,) তোমরা পরস্পর একে অন্যের সাথে নিরাবরণভাবে সাক্ষাৎ করেছ (অর্থাৎ সহবাস করেছ কিংবা অবাধ নির্জনতায় মিলিত হয়েছ; এটাও সহবাসেরই পর্যায়ভুক্ত। মোট কথা, স্ত্রী নিজ সত্তাকে তোমাদের আনন্দ উপভোগের জন্য তোমাদের কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে। মোহরানা এ আত্ম-সমর্পণেরই বিনিময়। সুতরাং যার বিনিময়, তা অর্জন করার পর বিনিময়কে ফেরত গ্রহণ করা অথবা বিনিময় প্রদান না করা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যদি ঐ অর্থ মোহরানা না হয়ে দান হয়, তবে এই নিরন্তরায় অর্থ ফেরত গ্রহণে বাধা দান করে এবং প্রকৃত অন্তরায় হল বৈবাহিক সম্পর্ক।) আর (দ্বিতীয় বাধা এই যে,) নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছে (অঙ্গীকার এই যে, বিবাহের সময় তোমরা মোহরানা নিজ দায়িত্বে রেখেছিলে। অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করাও বিবেকের কাছে নিন্দনীয়। যদি তা দান কিংবা উপহার হয়, তবে নিরাবরণ মিলনের পূর্বে এ অঙ্গীকারও বৈবাহিক

সম্পর্কের প্রতিক্রিয়া হওয়ার কারণে সে দান ফেরত গ্রহণে বাধা দান করে। মোট কথা, চারটি বাধা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ফেরত গ্রহণ করা খুবই নিন্দনীয়)।

ইসলাম-পূর্ব যুগের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ঃ আলোচ্য আয়াত তিনটিতে সেই সব নির্যাতন প্রতিরোধ করা হয়েছে, যেগুলো ইসলাম-পূর্ব কালে অবলাদের প্রতি নিতান্ত সাধারণ আচরণ বলে মনে করা হতো। তন্মধ্যে একটি সর্ববৃহৎ নির্যাতন ছিল এই যে, পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর জান ও মালের মালিক মনে করতো। স্ত্রী যার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো, সে তার প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করতো। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসরা যেমন তার ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিস ও মালিক হতো, তেমনি তার স্ত্রীরও ওয়ারিস ও মালিক বলে গণ্য হতো। ইচ্ছা করলে নিজেই তাকে বিয়ে করতো কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তাকে বিয়ে দিয়ে দিতো। স্বামীর (অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত) পুত্র নিজেও পিতার মৃত্যুর পর তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারতো। স্ত্রীর প্রাণেরই যখন এই অবস্থা, তখন তার ধন-সম্পদের ব্যাপারটি তো বলাই বাহুল্য। এই একটি মাত্র মৌলিক ভ্রান্তির ফলশ্রুতিতে নারীদের উপর নানা ধরনের অগণিত নির্যাতন চলতো। উদাহরণত ঃ

এক---যেসব অর্থ-সম্পদ স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা পিত্রালয় থেকে উপঢৌকন হিসাবে লাভ করতো, সেগুলো হজম করে ফেলা হতো।

দুই---যদি কোন নারী তার নিজের অংশের ধন-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই নিতো, তবে পুরুষরা তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিত, যাতে ধন-সম্পদ বাইরে নিয়ে যেতে না পারে ; বরং এখানেই মারা যায় এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারভুক্ত থেকে যায়।

তিন---মাঝে মাঝে স্ত্রীর কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও শুধু স্বভাবগতভাবে স্বামী তাকে অপছন্দ করতো এবং স্ত্রীর প্রাপ্য আদায় করতো না। অপরপক্ষে তালাক দিয়ে তাকে মুক্তও করতো না, যাতে সে অতিষ্ঠ হয়ে অলংকার ও মোহরানা বাবদ প্রদত্ত টাকা ফেরত দেয় কিংবা অপ্রদত্ত মোহরানা ক্ষমা করে দেয়! মাঝে মাঝে স্বামী তালাক দিয়েও তালাকপ্রাপ্তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিত না, যাতে সে বাধ্য হয়ে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত দেয় কিংবা আদায়-যোগ্য মোহরানা ক্ষমা করে দেয়।

চার---কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়ারিসরা বিধবাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিত না---মূর্খতাপ্রসূত লজ্জার কারণে কিংবা কিছু অর্থ আদায় করার লোভে।

এ সব নির্যাতনের ভিত্তি ছিল এই যে, তারা নিজেদেরকে স্ত্রীর সম্পত্তি এমন কি, তার প্রাণেরও মালিক মনে করতো। কোরআন পাক এসব অনর্থের সেই মূলটি উৎপাটন করে দিয়েছে এবং এর আওতায় সংঘটিত নির্যাতনসমূহের প্রতিকার কল্পে ঘোষণা করেছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের মালিক হয়ে বস।"

'বলপূর্বক' কথাটি এখানে শর্ত হিসাবে বলা হয়নি, যাতে মনে হবে নারীদের সম্মতি-ক্রমে তাদের মালিক হওয়া হয়ত শুদ্ধ হবে, বরং বাস্তব ঘটনা বর্ণনার জন্য সংযুক্ত হয়েছে। শরীয়তসম্মত ও যুক্তিগত কারণ ছাড়াই নারীদের মালিক হয়ে যাওয়া বলপূর্বকই হতে পারে। কোন বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানী নারী এতে সম্মত হতে পারে না। —(বাহরে মুহীত)

এ কারণেই শরীয়ত এ ব্যাপারে তার সম্মতিকে গুরুত্ব দেয়নি। কোন নারী নির্বুদ্ধিতাবশত কারও মালিকানাধীন হতে রাযী হলেও ইসলামী আইন এতে রাযী নয় যে, কোন স্বাধীন মানুষ কারও মালিকানাধীন চলে যাবে।

জুলুম ও অনর্থ নিষিদ্ধ করার সাধারণ পন্থা হচ্ছে নেতিবাচক আদেশের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা। কিন্তু এ স্থলে কোরআন সাধারণ পন্থা বাদ দিয়ে لَا يَحِلُّ বলে নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছে। এতে ব্যাপারটি যে কঠোর গোনাহ্ তার ঊর্ধ্বেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, যদি কেউ কোন প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে তার সম্মতি ও অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে করে, তবে এ বিয়ের দ্বারা উভয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয় না এবং উত্তরাধিকার স্বত্ব এবং বংশের বিধানাবলীও এর সাথে সম্পৃক্ত হয় না।

এমনিভাবে যদি কেউ কোন স্ত্রীলোককে জোর-জবরদস্তি করে তার কাছ থেকে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত গ্রহণ করে কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা মাফ করিয়ে নেয়, তবে এই জোর-জবরদস্তি ফেরত গ্রহণ ও ক্ষমা শরীয়তে ধর্তব্য নয়। এর ফলে গ্রহণকৃত অর্থ স্বামীর জন্য হালাল হয় না এবং কোন প্রাপ্য মাফ হয় না। এ বিষয়টিরই অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ —অর্থাৎ নারীদেরকে ইচ্ছা মত বিয়ে করতে বাধা দিও না এরূপ ধারণা করে যে, যে অর্থ তোমার অথবা তোমা-দের স্বজনরা তাদেরকে মোহরানা কিংবা উপঢৌকন হিসাবে দান করেছে, তা তাদের কাছ থেকে ফেরত গ্রহণ করবে। নির্ধারিত মোহরানা মাফ করানোও মোহরানা দিয়ে ফেরত গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত। মোট কথা, প্রদত্ত মোহরানা বলপূর্বক ফেরত নেওয়া কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা বলপূর্বক মাফ করানো, এ সবই অবৈধ ও হারাম। এমনিভাবে যে অর্থ উপঢৌকন হিসাবে স্ত্রীর মালিকানায় প্রদান করা হয়, তা ফেরত নেওয়াও স্বামীর জন্য এবং ওয়ারিসদের জন্য হালাল নয়। 'মালিকানায় প্রদান' বলার তাৎপর্য এই যে, স্বামী যদি কোন অলংকার অথবা অন্য কোন ব্যবহারিক বস্তু স্ত্রীকে ধার হিসাবে ব্যবহারের জন্য দান করে, তবে তা স্ত্রীর মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয় না এবং তা ফেরত গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ নয়।

এরপর إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ বলে এমন কিছু ব্যতিক্রমী অবস্থার কথা প্রকাশ করা হয়েছে, যেগুলোতে স্বামীর জন্য প্রদত্ত মোহরানা ইত্যাদি ফেরত গ্রহণ করা বৈধ হয়ে যায়।

অর্থাৎ যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোন প্রকাশ্য অশোভন আচরণ প্রকাশ পায়, যদ্দরুন পুরুষ স্বভাবতই তালাক দিতে বাধ্য হয়, তবে এমতাবস্থায় প্রদত্ত মোহরানা ইত্যাদি ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা মাফ না করা পর্যন্ত স্বামী তালাক নাও দিতে পারে।

এখানে فاحشة শব্দের অর্থ অশোভন আচরণ বলতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আয়েশা (রা), যাহ্হাক প্রমুখের মতে স্বামীর অবাধ্যতা ও কুৎসিত গালি-গালাজ প্রভৃতি বোঝানো হয়েছে এবং আবূ কালাবা ও হাসান বসরীর মতে নির্লজ্জতা ও ব্যভিচার বোঝানো হয়েছে। সেমতে আয়াতের অর্থ হয় যে, নারীদের দ্বারা যদি কোন নির্লজ্জ কাজ সংঘটিত হয়ে যায় অথবা তারা অবাধ্যতা ও কটূক্তি করে, যদ্দরুন বাধ্য হয়ে পুরুষ তালাক দিতে উদ্যত হয়; তবে এমতাবস্থায় যেহেতু দোষ স্ত্রীর, তাই প্রদত্ত মোহরানা ফেরত গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা নির্ধারিত মোহরানা মাফ না করানো পর্যন্ত স্ত্রীকে বিবাহে আবদ্ধ রাখার অধিকার স্বামীর রয়েছে।

পরবর্তী দু'আয়াতেও এ বিষয়বস্তুটি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোন অবাধ্যতা ও নির্লজ্জতা প্রকাশ না পায়, কিন্তু স্বামী নিছক মনের খায়েশ ও খুশীর জন্য বর্তমান স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়, তবে এমতাবস্থায় যদি সে অগাধ অর্থ-সম্পদও তাকে দিয়ে থাকে, তবে তালাকের বিনিময়ে তার কোন অংশ ফেরত গ্রহণ করা কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা মাফ করানো স্বামীর জন্য বৈধ নয়। কেননা, এক্ষেত্রে স্ত্রীর কোন দোষ নেই এবং মোহরানা ওয়াজিব হওয়ার যে কারণ, তাও পূর্ণতা লাভ করেছে। অর্থাৎ বিয়েও হয়ে গেছে এবং উভয়ে পরস্পর মিলিতও হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রদত্ত অর্থ ফেরত গ্রহণ করার কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা মাফ করানোর কোন অধিকার তার নেই।

এরপর অর্থ ফেরত গ্রহণ যে জুলুম ও গোনাহ্ এ বিষয়টি তিন পর্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে ঃ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا অর্থাৎ তোমরা কি স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচার ইত্যাদির অপবাদ আরোপ করে প্রদত্ত অর্থ ফেরত গ্রহণের পথ বের করতে চাও? অর্থাৎ যখন একথা জানা যায় যে, প্রদত্ত অর্থ ফেরত গ্রহণ তখনই জায়েয, যখন স্ত্রী কোন অশোভন কাজ করে। তখন তার কাছ থেকে অর্থ ফেরত গ্রহণ করার মানে প্রকৃতপক্ষে এরূপ ঘোষণা করা যে, সে কোন অশোভন কাণ্ড ও নির্লজ্জতা ইত্যাদি করেছে। মুখে তার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করুক বা না করুক, এমতাবস্থায় এটা অপবাদেরই একটা রূপ। এটা যে প্রকাশ্য গোনাহ্ তা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় পর্যায় বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ —অর্থাৎ এখন তোমরা কেমন করে স্বীয় অর্থ তাদের কাছ থেকে ফেরত গ্রহণ করতে পার, যখন শুধু বিয়েই নয়, অবাধ নির্জনবাস এবং পরস্পরের মাঝে মিলনও হয়ে গেছে? কেননা, এমতাবস্থায় প্রদত্ত

অর্থ মোহরানা হলে স্ত্রী তার পূর্ণ অধিকারিণী ও মালিক হয়ে গেছে। কারণ, সে আপন সত্তাকে স্বামীর হাতে সমর্পণ করে দিয়েছে। এখন তা ফেরত নেওয়ার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বামীর নেই। আর যদি প্রদত্ত অর্থ উপঢৌকন হয়, তবুও এমতাবস্থায় তা ফেরত দেওয়া সম্ভবপর নয়। কেননা, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে অপরকে দান করলে তা ফেরত গ্রহণ শরীয়তমতে সিদ্ধ নয় এবং আইনতও তা কার্যকর হয় না। মোট কথা, বৈবাহিক সম্পর্ক দান-ফেরত গ্রহণের পরিপন্থী।

এ বিষয়টিই তৃতীয় পর্যায়ে বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا অর্থাৎ নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে নিয়েছে। এতে বিবাহ-বন্ধনে অঙ্গীকার বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র নামে খোতবা সহকারে জনসমক্ষে করা হয়।

মোট কথা এই যে, বৈবাহিক অঙ্গীকার ও পারস্পরিক মিলনের পর প্রদত্ত অর্থ ফেরত-দানের জন্য স্ত্রীকে বাধ্য করা প্রকাশ্য জুলুম ও অবিচার। মুসলমানদের এ রূপ আচরণ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۭ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ۭ وَسَاۗءَ سَبِيْلًا ۝۲۲ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۗىِٕكُمْ وَرَبَاۗىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۗىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۡ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۡ وَحَلَاۗىِٕلُ اَبْنَاۗىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝۲۳

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۗءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاۗءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۭ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ

فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ
بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝٢٤

(২২) যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না, কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে। এটা অশ্লীল, গযবের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ। (২৩) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা, ভগিনীকন্যা, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা—যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো ; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, দয়ালু। (২৪) এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়—এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্র হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্য সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য—ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ্ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ।

যোগসূত্র ঃ পূর্ব থেকে জাহিলিয়াত 'কুপ্রথার বিষয় বর্ণিত হয়ে' আস্ছে। তন্মধ্যে একটি প্রথা ছিল যে, তারা কোন কোন হারাম নারী ; যেমন বিমাতাকে বিয়ে করতো। এক বোন বিবাহে থাকা অবস্থায় অন্য বোনকে বিয়ে করতো। এর সাথে সম্পর্ক রেখে অন্য হারাম নারীদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া তারা পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম মনে করতো। একেও বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এমন কিছু-সংখ্যক স্ত্রীলোকের বৈধতাও বর্ণিত হয়েছে, যাদের সম্পর্কে মুসলমানদের সন্দেহ ছিল। যেমন, এমন ক্রীতদাসী যে মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে এবং তার প্রথম স্বামী দারুল-হরবে থেকে যায়। এতদসঙ্গে বিয়ের শর্তাবলী, মোহরানা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টও বর্ণিত হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা ঐ নারীদেরকে বিয়ে করো না, যাদেরকে তোমাদের পিতা (অথবা দাদা অথবা নানা) বিয়ে করে ; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে (ভবিষ্যতে এটা যেন আর না হয়)। নিশ্চয়

এটি (এ বিষয়টি যুক্তিগতভাবেও) খুব অশ্লীল (সুস্থ বিবেকবান লোকদের পরিভাষায়ও) অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং (শরীয়তের আইনেও) নেহায়েত মন্দ পন্থা। তোমাদের জন্য (এসব নারী) হারাম করা হয়েছে (অর্থাৎ তাদেরকে বিয়ে করা হারাম ও বাতিল। তারা কয়েক প্রকার। প্রথম, বংশগত হারাম নারী। তারা হচ্ছে) তোমাদের জননী, তোমাদের কন্যা (ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সবই তাদের অন্তর্ভুক্ত), তোমাদের বোন (সহোদরা হোক, বৈমাত্রেয়ী হোক কিংবা বৈপিত্রেয়ী), তোমাদের ফুফু (এতে পিতার এবং সব ঊর্ধ্বতন পুরুষের তিন প্রকার বোন অন্তর্ভুক্ত আছে), তোমাদের খালা (এতে মাতার এবং সব ঊর্ধ্বতন নারীর তিন প্রকার বোন রয়েছে), ভ্রাতৃকন্যা (এতে তিন প্রকার ভাই-এর সব প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সন্তান অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় প্রকার দুধ-সম্পর্কিত হারাম নারী। তারা হচ্ছে) তোমাদের ঐসব মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে (অর্থাৎ ধাত্রী) এবং তোমাদের ঐসব বোন, যারা দুধ পান করার কারণে বোন (অর্থাৎ তোমরা তাদের আপন অথবা তারা তোমাদের আপন কিংবা দুধ-মার দুধ পান করেছে; যদিও বিভিন্ন সময়ে পান করে)। এবং (তৃতীয় প্রকার শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী। তারা হচ্ছে) তোমাদের স্ত্রীদের মাতা (এতে স্ত্রীর সব ঊর্ধ্বতন নারী এসে গেছে), তোমাদের স্ত্রীদের কন্যা (এতে স্ত্রীর সব অধঃস্তন নারী এসে গেছে), যারা (স্বভাবতই) তোমাদের লালন-পালনে থাকে (কিন্তু এতে একটি শর্তও আছে। তা এই যে, কন্যারা) ঐ স্ত্রীদের গর্ভজাত (হওয়া চাই) যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ। (অর্থাৎ কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করার কারণেই শুধু তার কন্যা হারাম হয় না; বরং যখন কোন স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস হয়ে যায়, তখন তার কন্যা হারাম হয়।) এবং যদি (এখনও) তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করে থাক (যদিও বিয়ে হয়ে যায়), তবে (এমন স্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করায়) তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই। এবং তোমাদের ঐ সব পুত্রের স্ত্রী (-ও হারাম), যারা তোমাদের ঔরসজাত (এতে সব অধঃস্তন পুরুষের স্ত্রী এসে গেছে। 'ঔরসজাত'-এর অর্থ এই যে, পোষ্য-পুত্রের স্ত্রী হারাম নয়।) এবং এটাও (হারাম) যে, তোমরা দু বোনকে (দুধ বোন হোক কিংবা বংশগত হোক বিয়েতে) একত্রিত রাখ; কিন্তু যা (এ বিধানের) আগে হয়ে গেছে (তা মাফ)। নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু (দয়া দ্বারা গোনাহ্ মাফ করে দেন)। এবং চতুর্থ প্রকার ঐসব নারী, যারা সধবা; কিন্তু (এই প্রকারে তারা ব্যতিক্রম) যারা (শরীয়তসম্মতভাবে) তোমাদের দাসী হয়ে যায় (এবং তাদের হরবী স্বামী দারুল-হরবে থাকে। তারা এক হায়েযের পর কিংবা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসবের পর হালাল)। আল্লাহ্ এ সব বিধান তোমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন। এ সব নারী ছাড়া অন্য সব নারী তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। (অর্থাৎ) তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে (বিয়ে আনতে) চাইবে। (অর্থাৎ বিবাহে মোহরানা অবশ্যই থাকতে হবে এবং) এভাবে যে, তোমরা (তাদেরকে) স্ত্রী বানাবে (এর শর্তাবলী শরীয়তে প্রসিদ্ধ। উদাহরণত সাক্ষী থাকা এবং বিয়ে নির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য না হওয়া ইত্যাদি)। শুধু কাম-প্রবৃত্তিই চরিতার্থ করবে না (যিনা, মুত'আ সবই এর ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত; যদিও তাতে অর্থ ব্যয় করা হয়) অতঃপর (বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর শরীয়ত-সিদ্ধ পন্থা-সমূহের মধ্য থেকে) যে পন্থায় তোমরা নারীদেরকে ভোগ কর, (তার বিনিময়ে) তাদেরকে

মোহরানা দাও যা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এবং (এরূপ মনে করো না যে, এই নির্দিষ্ট পরিমাণে নামায-রোযার মত কমবেশী হতে পারে না ; বরং) নির্দিষ্ট হওয়ার পরও যার উপর (অর্থাৎ যে পরিমাণের উপর) তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) পরস্পরে সম্মত হও, তাতে তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই। (উদাহরণত স্বামী মোহরানা বৃদ্ধি করে দিল কিংবা স্ত্রী হ্রাস করে দিল অথবা মাফই করে দিল---সব দুরস্ত।) নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত জ্ঞানী (তোমাদের উপযোগিতা খুব জানেন), গভীর রহস্যবিদ (এ সব উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান নির্ধারণ করেছেন ; যদিও কোন কোনটি তোমাদের বোধগম্য নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে যাদের সাথে বিয়ে হারাম, এমন নারীদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কোন কোন হারাম নারী কোন অবস্থাতেই হালাল হয় না ; তাদেরকে 'মোহাররামাতে-আবাদীয়্যা' (চিরতরে হারাম) বলা হয়। কোন কোন নারী চিরতরে হারাম নয়, কোন কোন অবস্থায় তারা হালালও হয়ে যায়।

প্রথমোক্ত তিন প্রকার ঃ (১) বংশগত হারাম নারী, (২) দুধের কারণে হারাম নারী এবং (৩) শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী চিরতরে হারাম। শেষোক্ত এক প্রকার অর্থাৎ পর-স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত পরের স্ত্রী থাকে তখন পর্যন্ত হারাম।

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ—জাহিলিয়াত যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্রেরা বিনাদ্বিধায় বিয়ে করে নিতো। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং একে 'আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ' বলে অভিহিত করেছেন। বলা বাহুল্য, যাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মা বলা হয়, পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী করে রাখা মানব-চরিত্রের জঘন্য অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

মাস'আলা ঃ আয়াতে পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম বলা হয়েছে। এতে এরূপ কোন কথা নেই যে, পিতা যদি তার সাথে সহবাসও করে। কাজেই যে কোন স্ত্রীলোকের সাথে পিতার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে পুত্রের পক্ষে তাকে বিয়ে করা কখনও হালাল নয়।

এমনিভাবে পুত্রের স্ত্রীকে পিতার পক্ষে বিয়ে করা হালাল নয় ; যদিও পুত্র শুধু বিয়েই করে---সহবাস না করে। আল্লামা শামী বলেন ঃ

وتحرّم زوجة الاصل و الفرع بمجرّد العقد دخل بها اولا

মাস'আলা ঃ যদি পিতা কোন স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচার করে, তবুও তাকে বিয়ে করা পুত্রের পক্ষে হালাল নয়।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ —অর্থাৎ আপন জননীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে। اُمَّهَات শব্দের ব্যাপকতায় দাদী, নানী সবই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

وَبَنَاتُكُمْ —স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। কন্যার কন্যাকে এবং পুত্রের কন্যাকেও বিয়ে করা হারাম।

মোট কথা কন্যা, পৌত্রী, প্রপৌত্রী, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী এদের সবাইকে বিয়ে করা হারাম এবং অন্য স্বামীর ঔরসজাত সৎকন্যাকে বিয়ে করা জায়েয কি না—সে সম্পর্কে পরে বর্ণনা করা হবে। যে পুত্র-কন্যা ঔরসজাত নয়; বরং পালিত, তাদের এবং তাদের সন্তানকে বিয়ে করা জায়েয—যদি অন্য কোন পথে অবৈধতা না থাকে। এমনিভাবে ব্যভিচারের মাধ্যমে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সেও কন্যারই পর্যায়ভুক্ত। তাদের বিয়ে করাও দুরস্ত নয়।

وَاَخَوَاتُكُمْ —সহোদরা ভগিনীকে বিয়ে করা হারাম। এমনিভাবে বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী ভগিনীকেও বিয়ে করা হারাম।

وَعَمَّاتُكُمْ —পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী বোনকে বিয়ে করা হারাম। তিন প্রকার ফুফুকেই বিয়ে করা যায় না।

وَخَالَاتُكُمْ —আপন জননীর তিন প্রকার বোন, প্রত্যেকের সাথেই বিয়ে করা হারাম।

وَبَنَاتُ الْاَخِ —ভ্রাতুষ্পুত্রীর সাথেও বিয়ে হারাম; আপন হোক, বৈমাত্রেয় হোক—বিয়ে হালাল নয়।

وَبَنَاتُ الْاُخْتِ —বোনের কন্যা অর্থাৎ ভাগ্নীর সাথেও বিয়ে করা হারাম। এখানেও বোনকে ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে।

وَاُمَّهَاتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ—যেসব নারীর স্তন্যপান করা হয়, তারা জননী না হলেও বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে জননীর পর্যায়ভুক্ত এবং তাদের সাথে বিয়ে হারাম। অল্প দুধ পান করুক কিংবা বেশী, একবার পান করুক কিংবা একাধিক বার—সর্বাবস্থায় তারা হারাম হয়ে যায়। ফিকহ্‌বিদদের পরিভাষায় একে 'হরমতে-রিযাআত' বলা হয়।

তবে এতটুকু স্মরণ রাখা জরুরী যে, শিশু অবস্থায় দুধ পানের সময়ে দুধ পান করলেই এই হরমতে-রিযাআত কার্যকরী হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ انما الرضاعة من

المجاعة অর্থাৎ দুধ পানের কারণে যে অবৈধতা প্রমাণিত হয়, তা সে সময়ে দুধ পান করলে হবে, যে সময় দুধ পান করে শিশু শারীরিক দিক দিয়ে বর্ধিত হয়। — (বুখারী, মুসলিম)

ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মতে এই সময়কাল হচ্ছে শিশুর জন্মের পর থেকে আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-র বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) সহ অন্যান্য ফিকহ্‌বিদের মতে মাত্র দু বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করলে অবৈধতা প্রমাণিত হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর ফতোয়াও তাই। কোন বালক-বালিকা যদি এ বয়সের পর কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করে, তবে এতে দুধ পানজনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ —অর্থাৎ দুধ পানের সাথে সম্পর্কিত যেসব বোন আছে, তাদেরকে বিয়ে করা হারাম। এর বিশদ বিবরণ এই যে, দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়কালে কোন বালক অথবা বালিকা কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে সে তাদের মা এবং তার স্বামী তাদের পিতা হয়ে যায়। এছাড়া সে স্ত্রীলোকের আপন পুত্র-কন্যা তাদের ভাই-বোন হয়ে যায়। অনুরূপ সে স্ত্রীলোকের বোন তাদের খালা হয়ে যায় এবং সে স্ত্রীলোকের ভাসুর ও দেবররা তাদের চাচা হয়ে যায়। তার স্বামীর বোনেরা শিশুদের ফুফু হয়ে যায়। দুধ পানের কারণে তাদের সবার পরস্পরে বৈবাহিক অবৈধতা স্থাপিত হয়ে যায়। বংশগত সম্পর্কের কারণে পরস্পরে যেসব বিয়ে হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণে সেসব সম্পর্কীয়দের সাথে বিয়ে হারাম হয়ে যায়। মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে—রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب

মাস'আলা ঃ একটি বালক ও একটি বালিকা কোন মহিলার দুধ পান করলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। এমনিভাবে দুধ ভাই ও বোনের কন্যার সাথেও বিয়ে হতে পারে না।

মাস'আলা ঃ দুধ ভাই কিংবা দুধ বোনের বংশগত মাকে বিয়ে করা জায়েয এবং বংশগত বোনের দুধ-মাকেও বিয়ে করা হালাল। এমনিভাবে দুধ বোনের বংশগত বোনের সাথে এবং বংশগত বোনের দুধ-বোনের সাথেও বিয়ে জায়েয।

মাস'আলা ঃ দুধ পানের সময়কালে মুখ কিংবা নাকের পথে দুধ ভেতরে গেলেও অবৈধতা প্রমাণিত হয়। যদি অন্য কোন পথে দুধ ভেতরে প্রবেশ করানো হয় কিংবা দুধের ইনজেকশন দেওয়া হয়, তবে অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

মাস'আলা ঃ স্ত্রীলোকের দুধ ছাড়া অন্য কোন দুধ ; যেমন চতুষ্পদ জন্তু কিংবা পুরুষের দুধ দ্বারা অবৈধতা প্রমাণিত হয় না।

মাস'আলা ঃ যদি দুধ ঔষধে কিংবা গরু—ছাগলের দুধের সাথে মিশ্রিত হয়, তবে দুধ পানজনিত অবৈধতা তখন প্রমাণিত হবে, যখন নারীর দুধ পরিমাণে অধিক হয়। সমান সমান হলেও অবৈধতা প্রমাণিত হয়, কম হলে নয়।

মাস'আলা ঃ কোন পুরুষের বুকে যদি দুধ হয় এবং তা কোন শিশু পান করে তবে এ দুধ পানের দ্বারা দুধ পানজনিত অবৈধতা বর্তায় না।

মাস'আলা ঃ দুধ পান করার ব্যাপারে সন্দেহ হলে তদ্দ্বারা অবৈধতা প্রমাণিত হয় না। যদি কোন মহিলা কোন শিশুর মুখে স্তন দেয়, কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তবে তাতে অবৈধতা প্রমাণিত হবে না এবং বিয়ে হালাল হবে।

মাস'আলা ঃ এক ব্যক্তি কোন একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করলো, অতঃপর অন্য একজন মহিলা বললো ঃ আমি তোমাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছি, যদি তারা উভয়ে এ কথার সত্যায়ন করে, তবে বিয়ে ফাসেদ বলে ফয়সালা হবে। পক্ষান্তরে উভয়ে যদি মিথ্যা বলে এবং মহিলা ধার্মিকা ও আল্লাহ্‌ভীরু হয়, তবু বিয়ে ফাসেদ বলে ফয়সালা হবে না। কিন্তু এর পরও তালাকের মাধ্যমে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া উত্তম।

মাস'আলা ঃ দুধপান-জনিত অবৈধতা প্রমাণ করার জন্য দুইজন ধার্মিক পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা দুগ্ধপান প্রমাণিত হবে না। কিন্তু ব্যাপারটি যেহেতু হারাম ও হালালের, তাই সাবধানতা উত্তম। এমন কি, কোন কোন ফিকহ্‌বিদ লিখেছেন যে, যদি কোন মহিলা বিয়ে করার সময় একজন ধার্মিক পুরুষ সাক্ষ্য দেয় যে, এরা উভয়েই দুধ ভাইবোন, তবে বিয়ে জায়েয হবে না। বিয়ের পরে সাক্ষ্য দিলে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই উত্তম। এমনকি একজন মহিলা সাক্ষ্য দিলেও বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করাই উত্তম হবে।

মাস'আলা ঃ দু'জন ধার্মিক পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা যেমন দুগ্ধপানজনিত অবৈধতা প্রমাণিত হয়, তেমনি একজন ধার্মিক পুরুষ ও একজন ধার্মিকা স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দ্বারাও এ অবৈধতা প্রমাণিত হয়ে থাকে। তবে সাক্ষীর নির্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ না হলেও সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য অবৈধতাকে অগ্রাধিকার দান করা উচিত।

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ—স্ত্রীদের মাতাও স্বামীর জন্য হারাম। এখানেও স্ত্রীদের নানী, দাদী বংশগত হোক কিংবা দুধগত—সবাই অন্তর্ভুক্ত।

মাস'আলা ঃ বিবাহিত স্ত্রীর মা যেমন হারাম, তেমনি ঐ মহিলার মাও হারাম, যার সাথে সন্দেহবশত সহবাস করে কিংবা ব্যভিচার করে কিংবা যাকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করে।

মাস'আলা ঃ শুধু বিবাহ দ্বারাই স্ত্রীর মা হারাম হয়ে যায়। এর জন্য সহবাস ইত্যাদি জরুরী নয়।

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

---যে মহিলাকে বিয়ে করে সহবাসও করেছে, সেই মহিলার অন্য স্বামীর ঔরসজাত কন্যা, পৌত্রী ও দৌহিত্রী হারাম হয়ে যায়। তাদেরকে বিবাহ করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি সহবাস না হয়---শুধু বিয়ে হয়, তবে উল্লিখিত নারীরা হারাম হয় না। বিয়ের পর যদি তাকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করে কিংবা তার গুপ্ত অঙ্গের অভ্যন্তরে কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তবে এগুলোও সহবাসের পর্যায়ভুক্ত। ফলে স্ত্রীর কন্যা হারাম হয়ে যায়।

মাস'আলা ঃ এখানে نِسَاۤئِكُمْ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত ; কাজেই ঐ মহিলার কন্যা। পৌত্রী ও দৌহিত্রীও হারাম হয়ে যায়, যার সাথে সন্দেহবশত সহবাস করে কিংবা ব্যভিচার করে।

وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ---পুত্রের স্ত্রী হারাম। পৌত্র, দৌহিত্রও পুত্র শব্দের ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাদের স্ত্রীকে বিয়ে করাও জায়েয হবে না।

مِنْ اَصْلَابِكُمْ ---কথাটি পোষ্যপুত্রকে বাইরে রাখার উদ্দেশ্যে সংযোজিত হয়েছে। তার স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল। দুধ-পুত্রও বংশগত পুত্রের পর্যায়ভুক্ত, কাজেই তার স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম।

وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ ---দুই বোনকে বিয়েতে একত্রিত করাও হারাম সহোদর বোন হোক কিংবা বৈমাত্রেয়ী কিংবা বৈপিত্রেয়ী হোক, বংশের দিক দিয়ে হোক কিংবা দুধের দিক দিয়ে---এ বিধান সবার জন্য প্রযোজ্য। তবে এক বোনের তালাক হয়ে যাওয়ার পর ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেলে কিংবা মৃত্যু হলে অপর বোনকে বিয়ে করা জায়েয---ইদ্দতের মাঝখানে জায়েয নয়।

মাস'আলা ঃ যেভাবে এক সাথে দুই বোনকে এক ব্যক্তির বিয়েতে একত্রিত করা হারাম, তেমনি ফুফু, ভ্রাতুষ্পুত্রী ও খালা ও ভাগ্নেয়ীকেও এক ব্যক্তির বিয়েতে একত্রিত করা হারাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (বুখারী, মুসলিম)

মাস'আলা ঃ ফিকহ্‌বিদগণ একটি সামগ্রিক নীতি হিসাবে লিখেছেন ঃ প্রত্যেক এমন দুজন মহিলা, যাদের মধ্যে একজনকে পুরুষ ধরা হলে শরীয়ত মতে উভয়ের পরস্পর বিয়ে দুরস্ত হয় না, তারা একজন পুরুষের বিয়েতে একত্রিত হতে পারে না।

اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ---অর্থাৎ জাহিলিয়াত যুগে যা কিছু হয়েছে, তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। এ বাক্যটি وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ আয়াতেও উল্লিখিত

হয়েছে। সেখানেও এই অর্থই যে, জাহিলিয়াত যুগে যা কিছু ঘটেছে, মুসলমান হওয়ার পর তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। তবে ভবিষ্যতে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

এমনিভাবে নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার সময় পিতার বিবাহিতা স্ত্রী কিংবা দুই বোন একত্রিত থাকলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো জরুরী। দুই বোন থাকলে এক বোনকে পৃথক করে দেওয়া অপরিহার্য।

বারা ইবনে আযেবের রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বুরদা ইবনে দীনারকে জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করার নির্দেশ নিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। কারণ সে পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। ---(মিশকাত)

ইবনে-ফিরোয দায়লামী পিতার কথা বর্ণনা করেনঃ যখন আমি মুসলমান হই, তখন দুই বোন এক সঙ্গে আমার স্ত্রী ছিল। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি বললেনঃ তাদের একজনকে তালাক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দাও এবং একজনকে রেখে দাও।---(মিশকাত)

এ সব রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, মুসলমান অবস্থায় যেমন প্রাথমিক পর্যায়ে পিতার বিবাহিতা স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রিত করা জায়েয নয়, তেমনি কাফির অবস্থায় এরূপ বিয়ে হয়ে থাকলে মুসলমান হওয়ার পর তা বহাল রাখাও জায়েয হবে না।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ---মুসলমান হওয়ার পূর্বে তারা নির্বুদ্ধিতাবশত যা কিছু করেছে, মুসলমান হওয়ার পর আল্লাহ্ তার জন্য তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং তাদের প্রতি দয়ার চোখে চাইবেন।

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ-অর্থাৎ যাদের স্বামী রয়েছে, এমন (সধবা) নারীও হারাম। যতদিন কোন মহিলা কোন ব্যক্তির স্ত্রী থাকে, অন্য ব্যক্তি তাকে বিয়ে করতে পারে না। এ থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, একজন মহিলা একই সময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। বর্তমান যুগের কোন কোন মূর্খ ধর্মদ্রোহী বলতে শুরু করেছে যে, পুরুষদের জন্য যখন একাধিক স্ত্রীর অনুমতি রয়েছে, তখন নারীদের জন্যও একাধিক স্বামী ভোগ করার অনুমতি থাকা উচিত। এ দাবী আলোচ্য আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই মূর্খরা বুঝে না যে, পুরুষের জন্য বহু-বিয়ে একটি নিয়ামত। এটা প্রত্যেক ধর্ম ও সম্প্রদায়ে বৈধ। মানবেতিহাস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু নারীর জন্য এক সময়ে একাধিক স্বামী থাকা স্বয়ং নারীর জন্যও বিপদের কারণ এবং যে দুজন পুরুষ এক নারীকে বিয়ে করবে, তাদের জন্যও নিছক নির্লজ্জতা। এ ছাড়া এতে সন্তানের বংশ নির্ধারণেরও কোন পথ খোলা থাকে না। যখন কয়েকজন পুরুষ একজন নারীকে ভোগ করবে, তখন যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তাকে তাদের মধ্য থেকে কোন একজনের সন্তান সাব্যস্ত করার কোন উপায় থাকবে না। এ ধরনের জঘন্যতম দাবী তারাই করতে পারে, যারা মানবতার জঘন্য দুশমন এবং যাদের লজ্জা-শরমের ধারণা পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। সন্তান ও পিতামাতার অধিকারের মাধ্যমে যে রহমত

আত্মপ্রকাশ করে, এরা তা থেকে সমগ্র মানবতাকে বঞ্চিত করার প্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে। যখন বংশ প্রমাণিত হবে না, তখন পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের দায়িত্ব কার স্কন্ধে আরোপ করা হবে ?

খাঁটি স্বভাব ও যুক্তির দিক দিয়েও যদি দেখা যায়, তবে একজন নারীর জন্য একাধিক স্বামী থাকার কোন বৈধতা দৃষ্টিগোচর হয় না।

(১) বিয়ের বুনিয়াদী লক্ষ্য হচ্ছে বংশ বিস্তার। এ দিক দিয়ে একাধিক মহিলা তো একজন পুরুষ দ্বারা গর্ভবতী হতে পারে ; কিন্তু একজন নারী একাধিক পুরুষ দ্বারা গর্ভবতী হতে পারে না। সে একজন দ্বারাই গর্ভবতী হবে। তাই একাধিক স্বামী থাকা অবস্থায় একজন ছাড়া অবশিষ্ট সব স্বামীর শক্তি বিনষ্ট হবে। কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া তাদের আর কোন উপকার অর্জিত হবে না।

(২) অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, নারী নরের তুলনায় অবলা। সে বছরের অধিকাংশ সময়ে ভোগ করারও যোগ্য থাকে না। কোন কোন অবস্থায় তার পক্ষে একজন স্বামীর হক পূর্ণ করাও সম্ভবপর হয় না। একাধিক স্বামী হলে কি অবস্থা হবে, তা অনুমান করা কষ্টকর নয়।

(৩) যেহেতু পুরুষ দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে নারীর তুলনায় অধিক সবল, তাই যদি কোন পুরুষের যৌন শক্তি স্বাভাবিকের চাইতে বেশী হয় এবং একজন নারী দ্বারা সে সন্তুষ্ট হতে না পারে, তবে তার জন্য বৈধ পন্থায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিয়ের সুযোগ থাকা দরকার। নতুবা সে অন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করবে এবং গোটা সমাজকে দূষিত করবে ; কিন্তু নারী দ্বারা এমন অনর্থ সৃষ্টির আশংকা কম।

ইসলামী শরীয়তে এ বিষয়টির গুরুত্ব এত অধিক যে, শুধু স্বামীর বর্তমানে নারীর অন্য বিয়েকে হারাম করা হয়নি ; বরং কোন নারীর স্বামী তালাক দিয়ে দিলে কিংবা মারা গেলে তার ইদ্দত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্তও অন্য কোন ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হতে পারে না।

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ এ বাক্যটি থেকে ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সধবা স্ত্রীকে অন্য ব্যক্তির বিয়ে করা জায়েয নয় ; কিন্তু কোন নারী যদি মালিকানাধীন দাসী হয়ে আসে, তবে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। মুসলমানরা যদি দারুল-হরবের কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এবং সেখান থেকে কিছু সংখ্যক নারী বন্দী করে আনে ; তবে এদের মধ্যে যে নারী দারুল-ইসলামে আসে এবং তার স্বামী দারুল-হরবে থেকে যায়, তার বিয়ে—দারুল ইসলামে আসার কারণে—পূর্ব স্বামীর সাথে ভেঙে যায়। এখন এই নারী ইহুদী, খৃস্টান কিংবা মুসলমান হলে দারুল ইসলামের যে কোন মুসলমান তাকে বিয়ে করতে পারে। আমীরুল-মু'মিনীন যদি তাকে দাসী করে কোন সিপাহীকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের মধ্যে দিয়ে দেয়, তবুও তাকে ভোগ করা জায়েয। কিন্তু এই বিয়েও ভোগ করা এক হায়েয আসার পরে কিংবা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করার পর জায়েয হবে।

মাস'আলা ঃ যদি কোন কাফির মহিলা দারুল-হরবে মুসলমান হয়ে যায় এবং তার স্বামী কাফির থাকে, তবে শরীয়তের বিচারক তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলবে। যদি সে অস্বীকার করে, তবে বিচারক তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ করবে। এ বিচ্ছেদ তালাক বলে গণ্য হবে। এরপর ইদ্দত অতিবাহিত হলে মহিলা যে কোন মুসলমানকে বিয়ে করতে পারবে।

كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ —অর্থাৎ যেসব হারাম নারীর কথা উল্লেখ করা হলো, তাদের অবৈধতা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মীমাংসিত।

কুরতুবী বলেন ঃ اى حرمة هٰذِهِ النساء كتا بًا من الله عليكم

অর্থাৎ উপরোক্ত নারীদের বিয়ে না করার নির্দেশ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের প্রতি মীমাংসিত করে দেওয়া হয়েছে।

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ অর্থাৎ উল্লিখিত হারাম নারীদের ছাড়া অন্যান্য নারী তোমাদের জন্য হালাল। উদাহরণত চাচার মেয়ে, খালার মেয়ে, মামাত বোন, মামা ও চাচার স্ত্রী—তাদের মৃত্যু অথবা তালাকের পর যদি তারা অন্য কোন সম্পর্ক দ্বারা হারাম না হয়। পালক পুত্রের স্ত্রী—যদি সে তালাক দিয়ে দেয় কিংবা মারা যায়, স্ত্রী মারা গেলে তার বোন—ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার আছে যাদের সবাইকে مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ -এর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

মাস'আলা ঃ এক সময়ে চারজনের অধিক নারীকে বিবাহে রাখা জায়েয নয়। সূরা আন্-নিসার শুরুতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। নিকটবর্তী কোন আয়াতে এর উল্লেখ না দেখে কেউ যেন ভুল করে না বসে যে, مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ -এর অর্থে ব্যাপকতার কারণে কোন বাধা-নিষেধ ছাড়াই নারীদেরকে বিয়ে করা জায়েয। এছাড়া অনেক হারাম নারীর কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিতও রয়েছে। তফসীর প্রসঙ্গে আমরা সেগুলো বর্ণনাও করেছি।

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ —অর্থাৎ হারাম নারীদের বর্ণনা এজন্য করা হয়েছে, যাতে তোমরা স্বীয় অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে হালাল নারীদের তালাশ কর এবং তাদের বিয়ে কর।

আবূ বকর জাস্‌সাস (র) 'আহ্‌কামুল-কোরআন'-এ লিখেছেন ঃ এ থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল। এক—মোহর ব্যতীত বিয়ে হতে পারে না; এমন কি, যদি স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সিদ্ধান্ত নেয় যে, মোহর ব্যতীত বিয়ে হবে, তবুও মোহর অপরিহার্য হবে। এর বিবরণ ফিকহ্ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। দুই—মোহর এমন বস্তু হতে হবে, যাকে 'মাল' বলা যায়।

হানাফীদের মাযহাব এই যে, দশ দিরহামের কম মোহর হওয়া উচিত নয়। উল্লেখ্য যে, সাড়ে তিন মাষা রৌপ্যে এক দিরহাম হয়।

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ —অর্থাৎ অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে হালাল নারী তালাশ কর এবং জেনো, মহিলাদের তালাশ সততা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য, যা বিয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। বিয়ের মাধ্যমে এটিই অর্জন কর; অর্থ ব্যয় করে ব্যভিচারের জন্য নারী তালাশ করো না।

এতে বোঝা গেল যে, ব্যভিচারীও অর্থ ব্যয় করে, কিন্তু সে অর্থ ব্যয়ও হারাম। এ অর্থ দ্বারা যে নারী অর্জন করা হয়, তাকে ভোগ করা হালাল হয় না।

غَيْرَ مُسَافِحِينَ —শব্দ বৃদ্ধি করে ব্যভিচার নিষিদ্ধ করত এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ব্যভিচারের মধ্যে শুধু কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ও বীর্যপাত করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কেননা, এতে সন্তানের বাসনা ও বংশ রক্ষার ইচ্ছা থাকে না। মুসলমানদের পবিত্র থাকা এবং মানব-বংশ বৃদ্ধি করার জন্য স্বীয় শক্তিকে যথাস্থানে ব্যয় করা উচিত। এর পন্থা হচ্ছে বিয়ে ও খরিদমুক্ত ক্রীতদাসীর মালিকানা।

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً —অর্থাৎ বিয়ের পরে যেসব নারীকে ভোগ করবে, তাদের মোহর দিয়ে দাও। এটা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে।

এ আয়াতে اسْتِمْتَاع (ভোগ করা) বলে স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা বোঝানো হয়েছে। যদি শুধু বিয়ে হয়, স্বামীর ঘরে না যায় এবং স্বামী ভোগ করার সুযোগ না পায়; বরং তার পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয়, তবে অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হয়। ভোগ করার সুযোগ পেলেই সম্পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হয়। এ আয়াতে বিশেষভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, যখন তোমরা কোন নারীকে ভোগ করে ফেল, তখন তাকে মোহর দেওয়া তোমাদের উপর সর্বতোভাবে ওয়াজিব হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ত্রুটি করা শরীয়তের আইনের খেলাফ। মানবিক লজ্জাবোধেরও তাকীদ এই যে, বিয়ের উদ্দেশ্য যখন হাসিল হয়ে গেছে, তখন স্ত্রীর অধিকার প্রদানে ত্রুটি ও টালবাহানা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তবে শরীয়ত স্ত্রীকে এ অধিকারও দেয় যে, মোহর 'মুয়াজ্জল' (অবিলম্বে পরিশোধযোগ্য) হলে মোহর পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে স্বামীর কাছে যেতে অস্বীকার করতে পারে।

মুতার অবৈধতা ঃ اسْتِمْتَاع —শব্দটির মূল ধাতু হচ্ছে م ت ع —এর অর্থ ফল লাভ হওয়া। কোন ব্যক্তি অথবা অর্থের দ্বারা ফল লাভ করলে তাকে اسْتِمْتَاع বলা হয়। ব্যাকরণের দিক দিয়ে কোন শব্দের ধাতুতে س ও ت সংযুক্ত করলে চাওয়া ও

অর্জনের অর্থ সৃষ্টি হয়। এই আভিধানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ -এর সোজা অর্থ সমগ্র উম্মতের মতে আমরা এইমাত্র উপরে যা বর্ণনা করেছি, তাই। কিন্তু এক-দল বলে যে, এখানে পারিভাষিক এবং প্রচলিত 'মূতা' বোঝানো হয়েছে। তাদের মতে আয়াতটি মূতা হালাল হওয়ার প্রমাণ। অথচ যাকে মূতা বলা হয়, আয়াত مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ-দ্বারা তা রদ হয়ে যাচ্ছে। এর ব্যাখ্যা পরে বর্ণিত হবে।

একদল লোক পরিভাষাগত মূতা বৈধ বলে দাবী করে। পরিভাষাগত মূতা হচ্ছে কোন নারীকে এরূপ বলা যে, এতদিনের জন্য এত টাকার বিনিময়ে কিংবা অমুক দ্রব্যের বিনিময়ে তোমার সাথে মূতা করছি। আলোচ্য আয়াতের সাথে পরিভাষাগত মূতার কোন সম্পর্ক নেই; শুধু শব্দটির মূলের প্রতি লক্ষ্য করেই এ দল দাবী করছে যে, আয়াত দ্বারা মূতার বৈধতা প্রমাণিত হচ্ছে।

প্রথম কথা এই যে, যখন অন্তত অন্য অর্থেরও সম্ভাবনা থাকবে (যদিও আমাদের মতে তা নির্দিষ্ট), তখন প্রমাণের পথ কি থাকতে পারে?

দ্বিতীয় কথা এই যে, কোরআন পাক হারাম নারীদের কথা উল্লেখ করার পর বলেছে ঃ তাদের ছাড়া স্বীয় অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে হালাল নারীদের তালাশ কর—এমতাবস্থায় যে, তোমরা 'বীর্যপাতকারী' না হও। অর্থাৎ শুধু কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা যেন না হয়। সাথে সাথে مُحْصِنِيْنَ কথাটিও যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পবিত্রতার প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। মূতা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়। তাই এতে সন্তান লাভ, ঘর-সংসার পাতা এবং পবিত্রতা ও সাধুতা উদ্দেশ্য থাকে না। এ জন্যই যে নারীর সাথে মূতা করা হয়, যারা মূতাকে হালাল বলতে চায় তারাও তাকে ওয়ারিসী স্বত্বের অধিকারিণী স্ত্রী সাব্যস্ত করে না এবং প্রচলিত স্ত্রীদের মধ্যেও গণ্য করে না। যেহেতু এর উদ্দেশ্য শুধু কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, তাই পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই সাময়িকভাবে নতুন নতুন নারী ও পুরুষ খুঁজে বেড়ায়। এমতাবস্থায় মূতা সাধুতা ও পবিত্রতার সহায়ক নয় বরং দুশমন।

হিদায়ার গ্রন্থকার ইমাম মালেক এ সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি মূতার বৈধতার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। হিদায়ার টীকাকার অন্যরা পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, এ ব্যাপারে হিদায়ার গ্রন্থকার ভুল করেছেন।

তবে কেউ কেউ দাবী করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) শেষ পর্যন্ত মূতার বৈধতার প্রবক্তা ছিলেন; অথচ আসল ব্যাপার তা নয়। ইমাম তিরমিযী ماجاء فى نكاح المتعة অধ্যায়ের আওতায় দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদীসটি এই ঃ

عن على بن ابى طالب ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى

عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الا هلية زمن خيبر-

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) খয়বর যুদ্ধের সময় নারীদের সাথে মূতা করতে এবং পালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন।

হযরত আলী (রা)-র এই হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফেও উদ্ধৃত রয়েছে। দ্বিতীয় হাদীসটি এই ঃ

عن ابن عباس قال انما كانت المتعة فى اوّل الاسلام حتّى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم - قال ابن عباس فكلّ فرج سواهما فهو حرامٌ ٥

—"হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ মূতা ইসলামের প্রাথমিক যুগে বৈধ ছিল। অতঃপর যখন إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

—আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন তা রহিত হয়ে গেল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এরপর শরীয়তসম্মত স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত দাসী ছাড়া সর্বপ্রকার গুপ্তাঙ্গ ব্যবহার করাই হারাম হয়ে গেছে।

একথা সত্য যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কিছুদিন পর্যন্ত মূতাকে জায়েয মনে করতেন। এরপর হযরত আলী (রা)-র বোঝানোর ফলে (যেমন মুসলিম ১ম খণ্ড ৪৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে) এবং—إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ আয়াতদৃষ্টে তিনি পূর্বমত পরিত্যাগ করেন। যেমন, তিরমিযীর উপরোক্ত রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল।

আশ্চর্যের বিষয়, যে দলটি মূতার বৈধতার প্রবক্তা, তারা হযরত আলী (রা)-র ভক্ত ও আনুগত্যের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে তাঁর বিরোধী।

فسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون

রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার কাযী আয়ায বর্ণনা করেন, খয়বর যুদ্ধের পূর্বে মূতা হালাল ছিল। খয়বর যুদ্ধের সময় হারাম করা হয়েছে। এরপর মক্কা বিজয়ের দিন হালাল করে দেওয়া হয় এবং তিন দিন পর চিরতরে হারাম ঘোষণা করা হয়।

এ ছাড়া এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ আল্লাহ্ তা'আলার

এই ফরমান এত সুস্পষ্ট যে, এতে দ্ব্যর্থতার কোন অবকাশ নেই। এ থেকে মূতার অবৈধতা পরিষ্কার বোঝা যায়। এর বিপরীতে কোন কোন অখ্যাত কিরাআতের আশ্রয় গ্রহণ করা নিতান্তই ভুল।

পূর্বেও বলা হয়েছে اسْتَمْتَعْتُمْ থেকে পারিভাষিক মূতা বুঝে নেওয়ার কোন প্রমাণ নেই। এটা নিছক একটা সম্ভাবনা إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ এর অকাট্য বিষয়বস্তুর কিছুতেই বিপরীত হতে পারে না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, উভয় প্রমাণ শক্তিতে সমান, তবে বলা হবে যে, উভয় প্রমাণ বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী। যদি পরস্পর বিরোধিতা মেনে নেওয়া হয়, তবুও সুস্থ বিবেকের তাকীদ এই যে, অবৈধতা প্রতিপন্নকারীকে বৈধতা প্রতিপন্নকারীর বিপরীতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

মাস'আলা ঃ মূতা বিয়ের মত 'মুয়াক্কাত' (সাময়িক) বিয়েও হারাম ও বাতিল। মুয়াক্কাত বিয়ে হলো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিয়ে করা। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মূতা বিয়েতে 'মূতা' শব্দ বলা হয় এবং মুয়াক্কাত বিয়ে 'নিকাহ্' শব্দের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ—অর্থাৎ পরস্পর মোহর নির্দিষ্ট করার পর নির্দিষ্ট মোহর অকাট্য হয়ে যায় না যে, তাতে কম-বেশী করা যাবে না; বরং স্বামী নিজের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট মোহর বৃদ্ধি করতে পারে এবং স্ত্রী ইচ্ছা করলে মনের খুশীতে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ মোহর ক্ষমাও করতে পারে। শব্দের ব্যাপকতা-দৃষ্টে বোঝা যায় যে, স্ত্রী যদি মুয়াজ্জল (অবিলম্বে পরিশোধযোগ্য) মোহরকে বিলম্বে পরিশোধযোগ্য মোহরে রূপান্তরিত করে দেয়, তবে তাও দুরস্ত এবং এতে কোন গোনাহ্ নেই।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا—আয়াতের শেষে এ বাক্যটি যুক্ত করে প্রথমত বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব খবর রাখেন। কেউ যদি উল্লিখিত বিধানসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে যদিও কোন বিচারক, শাসক বা মানুষ তা না জানে; কিন্তু আল্লাহ্ সব জানেন। তাঁকে সর্বাবস্থায় ভয় করতে থাকা উচিত।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে, বর্ণিত সমস্ত বিধান হিকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন সূক্ষ্ম বিষয়কে হিকমত বলা হয়, যা প্রত্যেকের বোধগম্য নয়। আয়াতে বর্ণিত অবৈধতা ও বৈধতা সম্পর্কিত বিধানাবলীর নিগূঢ় তাৎপর্য কারও বোধগম্য হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় সেগুলো মেনে নেওয়া জরুরী। কেননা, এ বিষয়ে আমাদের কারণ জানা না থাকলেও বিধানদাতা আল্লাহ্ তা'আলার তো জানা আছে, যিনি সর্বজ্ঞ ও রহস্যবিদ।

এ যুগের অনেক লেখাপড়া জানা মূর্খ লোক খোদায়ী বিধানের কারণ খুঁজে বেড়ায়। কোন কারণ জানা না গেলে, নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্র বিধানকে অনুপযোগী অথবা বর্তমান যুগের চাহিদার পরিপন্থী বলে এড়িয়ে যায়। আলোচ্য বাক্যে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া

হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ তোমরা মূর্খ, আল্লাহ্ তা'আলা বিজ্ঞ। তোমরা অবুঝ, আল্লাহ্ তা'আলা রহস্যাবিদ। সুতরাং নিজের বুদ্ধিমত্তাকে সত্যাসত্যের মাপকাঠি করো না।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ
مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ۚ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَ اٰتُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ
اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَاَنْ
تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٥﴾

(২৫) আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে। আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা পরস্পর এক; অতএব তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং নিয়মানুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে—ব্যভিচারিণী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবে না। অতঃপর যখন তারা বিবাহ বন্ধনে এসে যায়, তখন যদি কোন অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদেরকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ব্যবস্থা তাদের জন্য, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে। আর যদি সবর কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

যোগসূত্র ঃ পূর্ব থেকেই বিয়ের বিধানাবলী বর্ণিত হয়ে আসছে। তাই এ প্রসঙ্গে এখন শরীয়তসম্মত দাসীদেরকে বিয়ের কথা আলোচনা করা হচ্ছে। অতঃপর তাদের হক তথা শাস্তির বিধান সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, দাস ও দাসীর শাস্তি স্বাধীন পুরুষ ও নারীর শাস্তি থেকে ভিন্ন হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীদের বিয়ে করার পূর্ণ সামর্থ্য রাখে না, সে নিজেদের মধ্যকার মুসলমান দাসীদের যারা তোমাদের (শরীয়তসম্মত) মালিকানাধীন—বিয়ে করবে। (কেননা, অধিকাংশ দাসীর মোহর ইত্যাদি কম হয়ে থাকে

এবং তাদেরকে গরীবের ঘরে বিয়ে দিতে সংকোচও করা হয় না।) এবং (দাসীকে বিয়ে করতে সংকোচ করা উচিত নয়। কেননা, ধার্মিকতার দিক দিয়ে দাসী তোমাদের চাইতেও উত্তম হতে পারে। ধার্মিকতার শ্রেষ্ঠত্ব ঈমানের উপর ভিত্তিশীল)। তোমাদের ঈমানের পূর্ণ অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন (যে, কে উত্তম, কে অধম। কেননা, এটা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। অন্তরের পূর্ণ খবর আল্লাহ্ তা'আলারই জানা আছে। পার্থিব দিক দিয়ে সংকোচের বড় কারণ হচ্ছে বংশের বড় পার্থক্য। বংশের আসল উৎস হলেন হযরত আদম ও হাওয়া [আ]। উৎসের এই অভিন্নতার দিক দিয়ে) তোমরা সবাই পরস্পর একে অন্যের সমান। তাহলে সংকোচের কি কারণ? অতএব (সংকোচ না করার কারণ যখন জানা গেল, তখন উল্লেখিত প্রয়োজনের সময়) তাদেরকে বিয়ে কর, (কিন্তু তা) মালিকদের অনুমতিক্রমে (হওয়াও শর্ত) এবং তাদের (মালিকদের)-কে তাদের মোহরানা (শরীয়তের) নিয়মানুযায়ী প্রদান কর (এ মোহরানা প্রদান করা) এমতাবস্থায় (হবে) যখন, তাদেরকে বিবাহিতা স্ত্রী করা হবে—প্রকাশ্য ব্যভিচারিণী ও গোপন অভিসারিণী হবে না। (অর্থাৎ মোহরানাটি বিবাহের বিনিময় অনুযায়ীই হবে—ব্যভিচারের পারিশ্রমিক হিসাবে দিলে দাসী হালাল হবে না) অতঃপর যখন দাসীদের বিবাহিতা স্ত্রী করে নেওয়া হয়, তখন যদি তারা বড় অশ্লীলতার কাজ (অর্থাৎ যিনা) করে, তবে (প্রমাণের পর মুসলমান হওয়ার শর্তে) তাদের উপর ঐ শাস্তির অর্ধেক (প্রযোজ্য) হবে, যা (অবিবাহিতা) স্বাধীন নারীদের উপর হয়। (বিয়ের পূর্বেও দাসীদের বিয়ে করা ঐ ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত), যে তোমাদের মধ্যে (কামভাবের প্রবলতা ও স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার অসামর্থ্যতা হেতু) ব্যভিচারের (অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার) আশংকা রাখে। (যে ব্যক্তি এরূপ আশংকা রাখে না, তার জন্য দাসীকে বিয়ে করা উপযুক্ত নয়) এবং (যদি আশংকার অবস্থায়ও রিপুর উপর সংযম থাকে, তবে) (দাসীকে বিয়ে করার চাইতে) তোমাদের সবর করা অধিক উত্তম। এবং (এমনিতে) আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল (যদি আশংকা না থাকা অবস্থায়ও বিয়ে করে ফেল, তবে তিনি পাকড়াও করবেন না এবং) করুণাময় (যে, দাসীকে বিয়ে করা অবৈধ বলে আদেশ দেন নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

طول এর অর্থ শক্তি-সামর্থ্য। আয়াতের অর্থ এই যে, যার স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি-সামর্থ্য নেই কিংবা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই, সে ঈমানদার দাসীদেরকে বিয়ে করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, যতদূর সম্ভব স্বাধীন নারীকেই বিয়ে করা উচিত—দাসীকে বিয়ে না করাই বাঞ্ছনীয়। অগত্যা যদি দাসীকে বিয়ে করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসী খোঁজ করতে হবে।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মাযহাব তাই। তিনি বলেন ঃ স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দাসীকে অথবা ইহুদী-খৃস্টান দাসীকে বিয়ে করা মকরূহ।

হযরত ইমাম শাফিয়ী (র) ও অন্যান্য ইমামের মতে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও দাসীকে বিয়ে করা হারাম এবং ইহুদী বা খৃস্টান দাসী বিয়ে করা সর্বাবস্থায় অবৈধ।

মোট কথা, দাসীকে বিয়ে করা থেকে বেঁচে থাকা স্বাধীন পুরুষের জন্য সর্বাবস্থায় উত্তম। যদি অগত্যা করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসীকে করবে। কারণ, দাসীর গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে ঐ ব্যক্তির গোলাম হয়, যে দাসীর মালিক। অমুসলমান দাসীর গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে জননীর চাল-চলন অনুযায়ী ভিন্ন ধর্মের অনুসারী হয়ে যেতে পারে। অতএব, সন্তানকে গোলামির কবল থেকে রক্ষা করার জন্য এবং ঈমানদার বানানোর জন্য সন্তানের মাতার স্বাধীন হওয়া জরুরী। দাসী হলে কমপক্ষে ঈমানদার হওয়া দরকার, যাতে সন্তানের ঈমান সংরক্ষিত থাকে। এ কারণেই উলামায়ে-কিরাম বলেন ঃ স্বাধীন ইহুদী-খৃস্টান নারীকে বিয়ে করা যদিও বৈধ, কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা, ইহুদী ও খৃস্টান রমণীরা আজকাল সাধারণত স্বয়ং স্বামীকে ও স্বামীর সন্তানদেরকে স্বধর্মে আনার উদ্দেশ্যেই মুসলমানদের বিয়ে করে।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন। ঈমান শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। কোন কোন সময় গোলাম-বাঁদীও ঈমানের ক্ষেত্রে স্বাধীন পুরুষ ও নারী অপেক্ষা অগ্রে থাকতে পারে। কাজেই ঈমানদার দাসী বিয়ে করতে ঘৃণা করবে না; বরং তার ঈমানের মূল্য দেবে।

শেষে বলা হয়েছে ঃ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ অর্থাৎ স্বাধীন ও গোলাম সবাই একই মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং সবাই একই সত্তা থেকে উদ্ভূত। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে ঈমান ও তাকওয়া। মাযহারী বলেন ঃ

فهاتان الجملتان لتأنيس النّاس بنكاح الاماء ومنعهم عن الاستنكاف منهنّ -

অর্থাৎ মানুষ যাতে ক্রীতদাসীদের বিয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং একে ঘৃণার যোগ্য মনে না করে, সেজন্য এ দু'টি বাক্যের অবতারণা করা হয়েছে।

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

অর্থাৎ মালিকদের অনুমতিক্রমে দাসীদের বিয়ে কর। তারা অনুমতি না দিলে বিয়ে শুদ্ধ হবে না। কারণ, দাসীর নিজের উপরও কোন কর্তৃত্ব নেই। গোলামের অবস্থাও তদ্রূপ। সে প্রভুর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে পারে না।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ বাঁদীদের বিয়ে করে তাদের মোহরানা উত্তম পন্থায় আদায় করে দাও; অর্থাৎ টালবাহানা করো না এবং পুরোপুরি আদায় কর, বাঁদী মনে করে কষ্ট দিও না।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মালেকের মাযহাব এই যে, মোহর বাঁদীর প্রাপ্য। অন্য ইমামগণ বলেন ঃ বাঁদীর মোহরানার অর্থের মালিকও তার প্রভু।

مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَّلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ—অর্থাৎ মু'মিন বাঁদীদেরকে বিয়ে কর এমতাবস্থায় যে, সতী-সাধ্বী হয়, প্রকাশ্য ব্যভিচারিণী ও গোপন অভিসারিণী যেন না হয়। যদিও এখানে বাঁদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বিয়ের জন্য সতী-সাধ্বী বাঁদী অন্বেষণ কর ; কিন্তু স্বাধীন ব্যভিচারিণী নারীকে বিয়ে করা থেকে বেঁচে থাকাও উত্তম।

আয়াত থেকে জানা গেল যে, স্বাধীন নারী বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে বাঁদীকে বিয়ে কর। এ থেকে আরও জানা গেল যে, মুতা বৈধ নয়। কারণ, মুতা বৈধ হলে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য মুতাই ছিল সহজতম পথ। এতে যৌন-বাসনারও পরিতৃপ্তি হতো এবং আর্থিক বোঝাও বিয়ের তুলনায় অনেক কম হতো।

এছাড়া আয়াতে বাঁদীদের বিশেষণে مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা শুধুমাত্র কামসঙ্গিনীই হবে না। মুতার বেলায় কেবলমাত্র কামসঙ্গিনী হওয়া ছাড়া কিছুই হয় না। একজন নারী অল্প সময়ের মধ্যে কয়েক ব্যক্তির ব্যবহারে আসে। এমতাবস্থায় যেহেতু সন্তানকে কারও সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যায় না, তাই এতে বংশ-বিস্তারের উপকারও লাভ হয় না এবং সবার শক্তি শুধু যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার মধ্যেই বিনষ্ট হয়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ অর্থাৎ বাঁদীরা যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়, এবং তাদের সতী-সাধ্বী থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়, তখন যদি যিনা করে বসে, তবে এরা স্বাধীন নারীদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির অর্ধেক শাস্তি ভোগ করবে। এখানে অবিবাহিতা স্বাধীন নারী বোঝানো হয়েছে। অবিবাহিতা স্বাধীন নারী বা পুরুষ যিনা করলে তাদেরকে একশ বেত্রাঘাত করা হয়। সূরা আন-নূরের দ্বিতীয় আয়াতে এর উল্লেখ আছে। বিবাহিতা নারী বা পুরুষ যিনা করলে তাদের শাস্তি হচ্ছে রজম অর্থাৎ প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। যেহেতু এ শাস্তি অর্ধেক করা যায় না, তাই চার জন ইমামেরই মাযহাব হচ্ছে—গোলাম ও বাঁদী বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত, তারা যিনা করলে শাস্তি হবে পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। বাঁদীদের বিধান তো আয়াতেই উল্লেখিত আছে, গোলামের বিধানও এ থেকেই বোঝা যায়।

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ—অর্থাৎ বাঁদীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি ঐ ব্যক্তির জন্য, যার যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে।

وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ—অর্থাৎ যিনার আশংকা সত্ত্বেও যদি সবর কর এবং নিজেকে পবিত্র ও সৎ রাখতে পার, তবে এটা তোমাদের জন্য বাঁদীকে বিয়ে করার চাইতে উত্তম।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ—অর্থাৎ বাঁদীকে বিয়ে করা মকরূহ্। যদি এই মকরূহ্ কাজ করে ফেল, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করবেন। তিনি দয়ালুও বটে। কারণ, তিনি বাঁদীকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন ; নিষিদ্ধ করেন নি।

উল্লিখিত আয়াতের তফসীরে গোলাম ও বাঁদী বলতে শরীয়তের শর্ত অনুযায়ী অধিকৃত গোলাম ও বাঁদীকেও বোঝানো হয়েছে। এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, শরীয়ত-সম্মত গোলাম ও বাঁদী কারা? ইসলামী জিহাদে যেসব নারী ও পুরুষকে বন্দী করা হতো এবং আমীরুল-মু'মিনীন মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করে দিতেন, তারাই বাঁদী ও গোলামে পরিণত হতো। তাদের বংশধরও গোলাম-বাঁদী থেকে যেত। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এর ব্যতিক্রমও রয়েছে, এর বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ্ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। যেদিন থেকে মুসলমানরা শরীয়তের জিহাদ পরিত্যাগ করেছে এবং জিহাদ, শান্তি ও যুদ্ধের ভিত্তি ধর্মদ্রোহীদের ইশারা-ইঙ্গিতের উপর রেখে দিয়েছে, সেদিন থেকে তারা গোলাম ও বাঁদী থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেছে। বর্তমান যুগের চাকর-নকর এবং গৃহ-পরিচারিকারা গোলাম-বাঁদী নয়। কারণ, তারা স্বাধীন ও মুক্ত।

কোন কোন এলাকায় শিশুদেরকে বিক্রি করা হয় এবং গোলাম করে নেওয়া হয়। এটা পরিষ্কার হারাম। এতে তারা গোলাম হয়ে যায় না।

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

(২৬) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সবকিছু পরিষ্কার বর্ণনা করে দিতে চান, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ প্রদর্শন করতে চান এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান, আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। (২৭) আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান এবং যারা কামনা-বাসনার অনুসারী, তারা চায় যে, তোমরা পথ থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়ে পড়। (২৮) আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিধানাবলীর বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ বর্ণনা করেন যে, এসব বিধান প্রবর্তন করার মাঝে তোমাদের উপকারিতা ও উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে ; যদিও তোমরা তা বিস্তারিত না বুঝ। অতঃপর সাথে সাথে এসব বিধান পালন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের ঘৃণ্য দুরভিসন্ধি সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়েছে যে, এরা তোমাদের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কারণ, তারা তোমাদেরকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (উপরোক্ত বিষয়বস্তু এবং অন্য বিষয়বস্তুসমূহের বর্ণনা দ্বারা নিজের কোন উপকার চান না। এটা যুক্তির দিক দিয়ে অসম্ভব ; বরং তোমাদের উপকারের জন্য) চান যে, (বিধানাবলীর আয়াতসমূহে তো) তোমাদের কাছে (তোমাদের উপযোগিতার বিধানাবলী) বর্ণনা করে দেন এবং (কিস্‌সা-কাহিনীর আয়াতসমূহে) তোমাদের পূর্ববর্তী-দের অবস্থা তোমাদেরকে বলে দেন, (যাতে তোমাদের মধ্যে অনুসরণের আগ্রহ এবং বিরোধিতার প্রতি ভয় সৃষ্টি হয়)। এবং (মোটামুটি অভিন্ন উদ্দেশ্য এই যে,) তোমাদের প্রতি (রহমত সহকারে) অভিনিবেশ করেন। (বর্ণনা করা এবং বলে দেওয়াই অভি-নিবেশ। এতে আদ্যোপান্ত বান্দাদেরই উপকার)। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী (বান্দাদের উপ-যোগিতা জানেন) রহস্যবিদ (ওয়াজিব নয়, তবুও তিনি এসব উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। বিধানাবলী ও কিসসা-কাহিনী বর্ণনা দ্বারা) আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা তো তোমা-দের অবস্থার প্রতি (রহমত সহকারে) অভিনিবেশ করা, আর (কাফির ও পাপাচারীদের মধ্য থেকে) যারা প্রবৃত্তি পূজারী, তারা চায় যে, তোমরা (সৎপথ থেকে) বিরাট বক্রতায় পড়ে যাও (এবং তাদের মতই হয়ে যাও)। সেমতে তারা নিজেদের কুৎসিত চিন্তাধারা মুসলমানদের কানে প্রবেশ করাতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বিধানাবলীর ক্ষেত্রে যেমন তোমাদের উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তেমনি সেগুলোকে সহজ করার প্রতিও লক্ষ্য রাখেন ; যেমন বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা (বিধানাবলীতে) তোমাদের বোঝা হালকা (অর্থাৎ সহজও) করতে চান এবং (এর কারণ এই যে,) মানুষ (অন্য আদিষ্টদের তুলনায় দৈহিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রে) দুর্বল সৃজিত হয়েছে। (তাই তার দুর্বলতার উপযোগী বিধানাবলী নির্ধারিত করেছি। নতুবা উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে দুরূহ কর্ম নির্ধারণ করাতেও দোষ ছিল না। কিন্তু আমি সমষ্টিগতভাবে উভয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছি। এটা খুব জ্ঞান-গরিমা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিয়ের অনেকগুলো বিধান বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে তোমাদেরকে বিধানাবলী বলে দেন এবং পূর্ব-বর্তী পয়গম্বর ও পুণ্যবানদের অনুসৃত পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা মনে করবে না যে, হারাম ও হালালের এই বিবরণ শুধু তোমাদের জন্যই, বরং তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত

অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদেরকেও এ ধরনের বিধান বলা হয়েছিল। তারা এসব বিধান পালন করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্ত হয়েছে।

কামপ্রবৃত্তির অনুসারী যিনাকার এবং মিথ্যা ধর্মাবলম্বীদের কাছে হারাম-হালাল বলে কোন কিছুই নেই। তারা তোমাদেরকেও সৎপথ থেকে বিচ্যুত করে নিজেদের মিথ্যা পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট করতে চায়। তোমরা তাদের কাছ থেকে হুঁশিয়ার থাকবে। কোন কোন ধর্মে নিষিদ্ধ নারীদেরকেও বিয়ে করা দুরস্ত। বর্তমান যুগে অনেক ধর্মদ্রোহী বিয়ে প্রথা খতম করার পক্ষে কাজ করছে। কোন কোন দেশে নারীকে "ইজমালী সম্পত্তি" সাব্যস্ত করার পাঁয়তারা চলছে। এসব কথাবার্তা তারাই বলে, যারা আপাদমস্তক প্রবৃত্তির গোলাম। ইসলামের কলেমা উচ্চারণকারী কিছুসংখ্যক দুর্বল বিশ্বাসী লোক এসব ধর্মদ্রোহীর সাথে ওঠাবসা করে এবং তাদের কথায় মুগ্ধ হয়ে ধর্মীয় বিধানাবলীকে এ যুগের জীবনধারার ক্ষেত্রে অনুপযোগী বলে মনে করে। তারা শত্রুদের কথাবার্তাকে মানবতার উন্নতির পথ বলে ধারণা করতে শুরু করে। অজ্ঞাতসারেই এ খামখেয়ালীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, তারা যেমন আধুনিক মতাদর্শের সমর্থক, তাদের ধর্মও যদি এর অনুমতি দিত! নাউযুবিল্লাহ্! আল্লাহ্ পাক হুঁশিয়ার করেছেন যে, তোমরা এমন দুষ্টমতি লোকদের মতাদর্শ থেকে দূরে সরে থাকবে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে হালকা ও সহজ বিধান দিতে চান। তোমাদের অসুবিধা দূর করার জন্য বিয়ের ব্যাপারে এমন সরল বিধান তিনি দিয়েছেন, যা সবাই পালন করতে পার। স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি না থাকার ক্ষেত্রে বাঁদীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দান করেছেন। উভয় পক্ষকে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে মোহর নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সুবিচারের শর্তে একাধিক বিয়ে করার অনুমতিও দিয়েছেন।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا —অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। তার মাঝে কাম-বাসনার উপাদানও নিহিত রয়েছে। যদি তাকে নারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার আদেশ দেওয়া হতো, তবে সে আনুগত্য করতে অক্ষম হয়ে পড়ত। তার অক্ষমতা ও দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়নি; বরং উৎসাহিত করা হয়েছে। বিয়ের পর মন ও দৃষ্টির পবিত্রতা এবং আরও অনেক উপকারিতা অর্জিত হয়। ফলে উভয় পক্ষ শক্তি সঞ্চয় করে। সুতরাং বিয়ে দুর্বলতা দূর করার পারস্পরিক চুক্তি ও একটি অনুপম পন্থা।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ
نَارًا ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

(২৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। (৩০) আর যে কেউ সীমালংঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।

যোগসূত্র ঃ সূরা আন্-নিসার প্রথমে সমগ্র মানবজাতিকে একই পিতা-মাতার সন্তান এবং পরস্পর রক্ত সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ বলে উল্লেখ করে মানবজাতির পরস্পরের অধিকার সংরক্ষণ এবং একে অন্যের হক প্রদানের প্রতি সামগ্রিকভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতঃপর ইয়াতীম ও স্ত্রীলোকদের অধিকার সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এরপর ওয়ারিসী স্বত্বের বিশদ আলোচনা হয়েছে, যাতে নারী, ইয়াতীমসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের হক প্রদানের প্রতি তাকীদ রয়েছে। এরপর বিয়ের বিধি-নিষেধের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, কোন্ কোন্ স্ত্রীলোকের সাথে বিয়ে বৈধ এবং কোন্ কোন্ স্ত্রীলোকের সাথে তা বৈধ নয়। কেননা, বিয়ে একটা সম্পর্ক, যার দ্বারা একজন স্ত্রীলোকের উপর পূর্ণ অধিকার বিস্তার করার সুযোগ উপস্থিত হয়। আলোচ্য আয়াতে সাধারণভাবে সকল শ্রেণীর মানুষেরই জান ও মালের পূর্ণ হিফাযতের বিধান এবং সেগুলোর মধ্যে যে কোন অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতি নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। এতে নারী-পুরুষ, আপন-পর, মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ---(মাযহারী)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পর একে অন্যের সম্পদ অন্যায় (হালাল নয় এমন) পন্থায় ভোগ করো না। তবে (যদি হালাল পন্থায় হয় যেমন) যদি কোন ব্যবসার মাধ্যমে তা অর্জিত হয়, যা পরস্পরের সম্মতির মাধ্যমে আসে (অবশ্য শরীয়তের সকল শর্ত মোতাবেক যদি তা হয়) তবে তাতে দোষ নেই। (এটা ছিল সম্পদে হস্তক্ষেপ করার বিধান, অতঃপর জানের উপর হস্তক্ষেপের বিধান বলা হচ্ছে) এবং তোমরা একে অপরকে হত্যাও করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহপরায়ণ। (এ জন্যই একে অন্যের ক্ষতি করার পন্থাগুলো নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। বিশেষত কারো কোন ক্ষতি করলে পর সেও যেহেতু তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, তাই এরূপ পন্থা পরিহার করার নির্দেশ দিয়ে তোমাদেরকেও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন)। এবং (যেহেতু ক্ষতি করার বিভিন্ন পন্থার মধ্যে হত্যাই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক, এজন্য হত্যার কঠিন পরিণাম বর্ণনা করে বলা হচ্ছে) যে ব্যক্তি এরূপ কাজ (অর্থাৎ হত্যা) করবে (এমনভাবে যে,) শরীয়তের সীমালংঘন করে (এ সীমালংঘনও ভুলক্রমে নয় বরং) জুলুমের বশবর্তী হয়ে, তবে খুব শীঘ্রই

(অর্থাৎ মৃত্যুর পরই) তাকে (দোযখের আগুনে প্রবেশ করাবো এবং এ বিষয়টি অর্থাৎ এরূপ শাস্তি প্রদান) আল্লাহ্‌র পক্ষে খুবই সহজ। (কোন যোগাড়-যন্তরের প্রয়োজন হবে না যে, এমন ধারণা হতে পারে যে, কোন সময় হয়ত সে যোগাড়-যন্তর না হওয়ার দরুন সে শাস্তির আশংকা বিদূরিত হয়ে যাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নিজের সম্পদও অন্যায় পন্থায় ব্যয় করা বৈধ নয়ঃ আলোচ্য আয়াতের মধ্যে أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ—শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ "তোমাদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে" ---এর দ্বারা তফসীরকারেরা সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

আবূ হাইয়্যান 'তফসীরে-বাহ্‌রে মুহীত'-এ বলেন, আয়াতে এ শব্দগুলো দ্বারা নিজস্ব সম্পদও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আয়াতে لَا تَأْكُلُوا বলা হয়েছে। যার অর্থ 'খেয়ো না'। পরিভাষার বিচারে 'খেয়ো না' বলতে যে-কোনভাবে ভোগ-দখল বা হস্তক্ষেপ করো না বোঝানো হয়েছে। সেটা খেয়ে, পরিধান করে কিংবা অন্য যে কোন পন্থায় ব্যবহার করেই হোক না কেন! কেননা, সাধারণ পরিভাষায় সম্পদে যে কোন হস্তক্ষেপকেই 'খেয়ে ফেলা' বলা হয়, যদি সংশ্লিষ্ট বস্তুটি আদৌ খাদ্যবস্তু নাও হয়।

بِالْبَاطِلِ—শব্দটির তরজমা করা হয়েছে 'অন্যায় পন্থায়'; হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-মসউদ (রা) এবং অন্য সাহাবীগণের মতে শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয সব-গুলো পন্থাকেই বাতিল বলা হয়। যেমন চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাস-ভংগ, ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত।---(বাহ্‌রে-মুহীত)

'বাতিল' পন্থায় খাওয়াঃ কোরআন পাক একটিমাত্র শব্দ بِالْبَاطِلِ বলে অন্যায় পন্থায় অর্জিত সকল প্রকার সম্পদকে হারাম করে দিয়েছে। লেনদেন-এর ব্যাপারে অন্যায় পন্থা কি কি হতে পারে রসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, লেনদেন-এর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল (সা) যেসব বিষয়কে হারাম বলে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কোরআনে উল্লিখিত 'বাতিল' শব্দের ব্যাখ্যা মাত্র। ফলে হাদীসে উল্লিখিত অর্থনৈতিক লেনদেন বিষয়ক বিধি-নিষেধগুলোও প্রকৃত-পক্ষে কোরআনেরই নির্দেশ।

অবশ্য হাদীস শরীফে উল্লিখিত বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত প্রতিটি নির্দেশই প্রকৃত প্রস্তাবে কোরআনেরই নির্দেশ। এগুলো কোরআনের কোন কোন আয়াত বা শব্দ থেকে প্রাপ্ত ইশা-রার ভিত্তিতেই প্রদান করা হয়েছে। সে শব্দ বা আয়াতের ইশারা আমাদের বোধগম্য হোক বা না হোক---তাতে কিছু যায়-আসে না।

আয়াতের প্রথম বাক্যে বাতিল পন্থায় অন্যের সম্পদে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করার পর দ্বিতীয় বাক্যে বৈধ পন্থাগুলোকে সে নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

অর্থাৎ অন্যের অধিকারভুক্ত সে সম্পদ হারাম নয়, যা ব্যবসা-বাণিজ্য বা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে অর্জিত হয়।

একের মাল অন্যের নিকট হস্তান্তর করার বৈধ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ব্যবসা ছাড়া যদিও আরো অনেক পন্থা রয়েছে, যথা—ভাড়া, ঐচ্ছিক দান, হেবা, সদকা প্রভৃতি তবুও ব্যবসা-বাণিজ্যকেই অধিকতর প্রচলিত পন্থা হিসাবে গণ্য করা যায়।

অপরপক্ষে সাধারণভাবে 'তিজারত'-এর অর্থ শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইজারা, চাকুরী প্রভৃতি কায়িক শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত অর্থও 'তিজারত' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে যেমন মালের বিনিময়ে অর্থ লাভ হয়, তেমনি অন্যান্য পন্থায়ও শ্রম কিংবা অন্য কোন কিছুর বিনিময়েই অর্থলাভ হয়ে থাকে। ফলে সেগুলোও এক ধরনের 'তিজারত' বৈ কিছু নয়।—(মাযহারী)

সে হিসাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, অন্যায় পন্থায় কোন লোকের সম্পদ ভোগ করা হারাম। তবে যদি পারস্পরিক সম্মতির পন্থাসমূহ, যেমন—ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, চাকুরী প্রভৃতির মাধ্যমে তা হস্তান্তরিত হয়, তবে সে সম্পদের যে কোন রকম ভোগ-দখল জায়েয।

ব্যবসা ও শ্রম ঃ অন্যের সম্পদ লাভ করার বৈধ পন্থাগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র 'তিজারত' শব্দটি উল্লেখ করার একটা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে, জীবিকার্জনের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে ব্যবসা ও শ্রমের বিনিময়ে উপার্জনই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

সাহাবী হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন—রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—জীবিকার্জনের কোন্ পদ্ধতিটি সর্বোত্তম? জবাবে তিনি বলে বলেছিলেন ঃ

عمل الرجل بيده وكل مبيع مبرور (رواه احمد وحاكم)

অর্থাৎ ব্যক্তির হাতের শ্রম অথবা সমস্ত ধোঁকা-ফেরেবহীন পরিচ্ছন্ন ও সৎ বেচাকেনা।—(তারগীব ও তারহীব, মাযহারী)

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء

—সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গী হবে।
—(তিরমিযী)

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة

—সৎ ব্যবসায়িগণ কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ার নিচে থাকবে।

--(ইসফাহানী, তারগীব)

সৎ-রোজগারের শর্তাবলী ঃ হযরত মুআয-ইবনে জাবাল (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন---সর্বাপেক্ষা পবিত্র রোজগার হচ্ছে ব্যবসায়ীদের রোজগার। তবে শর্ত হচ্ছে, তারা যখন কথা বলবে, তখন মিথ্যা বলবে না। কোন আমানতের খেয়ানত করবে না। কোন পণ্য ক্রয় করার সময় সেটাকে মন্দ সাব্যস্ত করে মূল্য কম দেওয়ার চেষ্টা করবে না। নিজের মাল বিক্রয় করার সময় সে মালের অযথা তারিফ করে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করবে না। তার নিজের নিকট অন্যের ধার থাকলে পাওনাদারকে অযথা ঘোরাবে না। অপরপক্ষে তার কারো কাছে কিছু পাওনা থাকলে তাকে উত্যক্ত করবে না।

---(ইসফাহানী, তফসীরে-মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

انّ التجار يبعثون يوم القيامة فجّارًا الا من اتقى الله وبرّ وصدق ٥ (اخرجه الحاكم عن رفاعة بن رافع)

অর্থাৎ---যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, সৎভাবে লেনদেন করে এবং সত্য বলে---সে সব লোক ছাড়া কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা গোনাহ্গারদের কাতারে উত্থিত হবে।

অন্যের সম্পদ হালাল হওয়ার দুটি শর্ত ঃ আলোচ্য আয়াতে عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ বাক্যটি সংযুক্ত করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সে সব পন্থার সম্পদ অর্জন করা বৈধ ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং হারাম ও বাতিল পন্থা।

তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল এবং হারাম।

ফিকহ্বিদদের পরিভাষায় প্রথম পন্থাটিকে 'বাতিল' এবং দ্বিতীয়টিকে 'ফাসিদ' ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়।

মোট কথা, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মালের বিনিময়ে মালের হস্তান্তরকেই 'তিজারত' বা ব্যবসা বলা হয়। এমতাবস্থায় যদি কোন এক পক্ষে মাল থাকে এবং অন্যপক্ষে মাল না থাকে, তবে একে ব্যবসা বলা যায় না। যেমন---কেউ যদি এমন কোন পণ্য অগ্রিম বিক্রয় করে, যা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাতে আসা না-আসার কোন নিশ্চয়তা নেই, তবে সেটা ব্যবসা না হয়ে প্রতারণার পর্যায়ভুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

সুদের অবস্থাও অনেকটা তাই। সুদ বাবদ যা আদায় করা হয়, তা একটা সময়সীমার বিনিময় মাত্র। কিন্তু সময় যেহেতু কোন নির্দিষ্ট পণ্য নয়, তাই এর বিনিময় হতে পারে না।

জুয়া এবং ফটকাবাজারীর মধ্যেও অনুরূপ অনিশ্চয়তা থাকে বলেই তা তিজারত নয়, সম্পদ অর্জনের 'বাতিল' পন্থা মাত্র।

পারস্পরিক সন্তুষ্টির তাৎপর্য ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে তৃতীয় একটা পন্থা এমনও হতে পারে যে, তাতে উভয় পক্ষ থেকেই মালের আদান-প্রদান হয় এবং দৃশ্যত সন্তুষ্টিও দেখা যায়। কিন্তু এ পন্থায় এক পক্ষ যেহেতু অনন্যোপায় হয়ে ক্রয় বা বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, তাই বাহ্যত স্বাভাবিক ব্যবসা মনে হলেও পূর্বোক্ত দুটি পন্থার ন্যায় এটাও বাতিল এবং হারাম পন্থার অন্তর্ভুক্ত বলে ফিকহ্‌বিদরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন, কেউ বাজারের কোন একটা আবশ্যকীয় পণ্যের সমগ্র মওজুদ ক্রয় করে গুদামজাত করে ফেললো। অতঃপর সে তার ইচ্ছামত মূল্য নির্ধারণ করে তা বিক্রয় করতে শুরু করলো। এ অবস্থায় ক্রেতারা যেহেতু অনন্যোপায় হয়ে এ বর্ধিত মূল্য প্রদান করতে বাধ্য হয়, তাই এ ক্রয়-বিক্রয় যে সন্তুষ্টির সাথে হয় না, তা সুনিশ্চিত। এ কারণেই এরূপ ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা বাতিল পন্থায় অন্যের সম্পদ গ্রাস করার পর্যায়ভুক্ত, সুতরাং হারাম।

অনুরূপ কোন স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে এরূপ ব্যবহার শুরু করে, যার ফলে স্ত্রী মোহর মাফ করে দিতে বাধ্য হয়, তবে এ অবস্থায় যেহেতু সে ক্ষমা আন্তরিক সন্তুষ্টি প্রসূত নয়, তাই এটাও অর্থ আত্মসাৎ করার বাতিল পন্থারই অন্তর্ভুক্ত।

তেমনি কেউ যদি লক্ষ্য করে যে, তার ন্যায্য ও বাঞ্ছিত কাজ উৎকোচ ছাড়া সমাধা হওয়ার নয়, তখন যদি সে খুশির সাথেই কিছু দিয়ে কাজটা করিয়ে নেয়, তবে সেটাও সন্তুষ্টির সাথে দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে না। এরূপ আদান-প্রদানও বাতিল পন্থারই অন্তর্ভুক্ত।

এ আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল যে, আয়াতে উল্লিখিত ঃ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ০ বাক্যের মর্মানুযায়ী তিজারত বা ক্রয়-বিক্রয়ের শুধুমাত্র সে সমস্ত পন্থাই জায়েয, যেগুলো রসূল (সা)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং সমর্থিত হয়েছে। ফিকহ্‌বিদগণ শুধু এসব পন্থা লিপিবদ্ধ করেই ফিকহ্ শাস্ত্রের তিজারত অধ্যায়টি সংকলিত করেছেন। এ ছাড়া তিজারত ও লেন-দেনের অন্যান্য যেসব পন্থা বর্তমান রয়েছে, ইসলামী কানুন মোতাবিক সে সবগুলোই বাতিল এবং হারাম পন্থা।

আয়াতে উল্লিখিত 'বাতিল' শব্দটি এমন ব্যাপক অর্থবোধক যে, এর আওতায় স্বাভাবিক লেন-দেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হালাল ও বৈধ পন্থাসমূহের সীমারেখা বহির্ভূত অন্য সব পন্থাই শামিল রয়েছে।

আয়াতের তৃতীয় বাক্য ঃ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ—এর শাব্দিক অর্থ, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা করো না,—তফসীরকারদের সর্বসম্মতিক্রমে আত্মহত্যাও এ

আয়াতে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যকে হত্যা করার অবৈধতাও এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত।

আয়াতের প্রথম বাক্যে মানবসমাজের পারস্পরিক অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ এবং তৎপ্রতি বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছিল। আয়াতের এ অংশে জানের হিফাযত এবং তৎসম্পর্কিত অধিকারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রথমে মালের উল্লেখ করে পরে জানের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, জানের চাইতে অর্থনৈতিক অধিকারের সীমালংঘনের প্রবণতা ব্যাপক এবং খুব সহজেই মানুষ এতে জড়িত হয়ে পড়ে। হত্যা ও খুন-জখম যদিও অর্থনৈতিক অধিকার লংঘনের তুলনায় অনেক বেশী মারাত্মক অপরাধ, সন্দেহ নেই, কিন্তু তুলনামূলকভাবে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করার প্রবণতার চাইতে হত্যার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا —অর্থাৎ এ আয়াতে যে সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যথা, অন্যের সম্পদ অন্যায় পন্থায় আত্মসাৎ করো না কিংবা কাউকে হত্যা করো না---এসব নির্দেশ তোমাদের জন্যও আল্লাহ্‌র এক বিশেষ অনুগ্রহ বিশেষ। যেন তোমরা এসব অপরাধের পরকালীন শাস্তি এবং ইহকালীন দুর্ভোগ থেকে মুক্ত থাকতে পার।

এর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ○

অর্থাৎ কোরআনের এসব সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়ার পরও যদি কেউ জেনেশুনে এর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং জুলুম ও সীমালংঘনের পথ অবলম্বনের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করে কিংবা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আমি খুব শীঘ্রই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। 'জুলুম ও সীমালংঘনের মাধ্যমে' শব্দ যোগে বোঝা যাচ্ছে যে, যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশত এরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আয়াতে উল্লিখিত সাবধানবাণীর আওতা থেকে মুক্ত থাকবে।

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ○

(৩১) যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, যদি তোমরা সেসব বড় গোনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাবো।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে কতকগুলো কঠিন গোনাহ্ এবং সেগুলোতে জড়িত হওয়ার কঠিন শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। কোরআনের বিশেষ বর্ণনারীতিতে কোথাও কোন অপরাধের পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনের সাথে সাথেই যেসব লোক এ সব গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে, তাদের জন্য প্রতিশ্রুত পুরস্কারের কথাও শোনানো হয়। এ আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ পুরস্কারের কথা বলা হচ্ছে। তা এই যে, যদি তোমরা বড় গোনাহ্গুলো থেকে আত্মরক্ষা করতে পার, তবে ছোট ছোট ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো আমি নিজে থেকেই ক্ষমা করে দেব। এতে করে তোমরা সমস্ত ছোট-বড় তথা সগীরা-কবীরা গোনাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে সম্মান ও শান্তির সে স্থানে প্রবেশ করতে পারবে, যার নাম জান্নাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে সমস্ত (পাপ কাজ) থেকে তোমাদেরকে (প্রথম) নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যেগুলো কঠিন (পাপের) কাজ রয়েছে, তা থেকে যদি তোমরা বেঁচে থাকতে পার, তবে (এই বেঁচে থাকার কারণে আমি ওয়াদা করছি যে, তোমাদের সে সমস্ত সৎকর্মের দরুন যখন তা কবূল হয়ে যাবে) আমি তোমাদের হালকা ত্রুটিসমূহ (অর্থাৎ ছোট ছোট পাপসমূহ যা তোমাদেরকে দোযখে নিয়ে যেতে পারে) তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেব। (অর্থাৎ ক্ষমা করে দেব। তাতে তোমরা দোযখ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে)। আর আমি তোমাদেরকে একটি সম্মানিত স্থানে (অর্থাৎ বেহেশতে) প্রবিষ্ট করব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পাপের প্রকারভেদ ঃ উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, পাপের প্রকারভেদ দু'রকম। কিছু কবীরা অর্থাৎ কঠিন ও বড় রকমের পাপ, আর কিছু সগীরা অর্থাৎ হালকা ও ছোট পাপ। এ কথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যদি কেউ সাহস করে কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদের সগীরা গোনাহ্গুলো নিজেই ক্ষমা করে দেবেন।

যাবতীয় ফরয-ওয়াজিবসমূহ সম্পাদন করাও কবীরা গোনাহ্ থেকে বাঁচার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ফরয--ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করাও কবীরা গোনাহ্। বস্তুত যে লোক ফরয-ওয়াজিবসমূহ পালনের ব্যাপারে যথাযথ অনুবর্তিতা অবলম্বন করে এবং যাবতীয় কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ্ স্বয়ং তার সগীরা গোনাহ্সমূহের কাফ্ফারা করে দেবেন।

সৎকর্মসমূহ সগীরা গোনাহ্র প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ঃ প্রায়শ্চিত্ত অর্থ এই যে, কর্তার সৎকর্মসমূহকে সগীরা গোনাহের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেখিয়ে তার হিসাব সমান সমান করে দেওয়া হবে। জাহান্নামের পরিবর্তে সে জান্নাত প্রাপ্ত হবে। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন লোক যখন নামায পড়ার জন্য অযু করে, তখন প্রতিটি অঙ্গ ধৌত হওয়ার সাথে সাথে তার গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। মুখমণ্ডল ধুয়ে নিলে চোখ, কান ও নাক প্রভৃতি অঙ্গের পাপসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। কুলি করার সঙ্গে সঙ্গে জিহবার পাপের কাফ্ফারা হয়ে যায়; আর পা ধোয়ার সাথে সাথে ধুয়ে যায় পায়ের পাপসমূহ। তারপর যখন সে মসজিদের দিকে রওনা হয়, তখন প্রতিটি পদক্ষেপে পাপের কাফ্ফারা হতে থাকে।